বর্ষ ৩ সংখ্যা ১২ ■ ১ আগস্ট ১৯৯৭ ■ ১৭ শ্রাবণ ১৪০৪

শেলী

দাম ১৫ টাকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

অমাবস্যা'র জগৎ একদিকে স্বয়ংসিদ্ধ; অন্যদিকে তা বিশিষ্টভাবে ব্যক্তিসাক্ষিক, বাংলাদেশী ও আমাদের অধুনাতম সংকটেও প্রাসঙ্গিক।

তিন

এই উপন্যাসটি আমাকে এমনভাবে আপ্লুত করে যে আমি ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে পড়তে এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে জানতে ব্যাকুল হয়ে উঠি। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি খুব সহজে পাওয়া যায় নি; তাঁর অনেক লেখা এখনো গ্রন্থাকারে অসংগৃহীত হয়ে পুরনো পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সম্প্রতিকালে সৈয়দ আবুল মকসুদ ওয়ালীউল্লাহ্‌-র অনেকগুলি গল্প, দুটি কবিতা, একটি প্রবন্ধ ও কিছু চিঠিপত্র তঁর দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য' (১৯৮১, ১৯৮৩) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌ সম্পর্কে এটিই এখনো পর্যন্ত একমাত্র প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। এই বছরের গোড়ায় ঢাকায় থাকাকালে মকসুদ সাহেব তাঁর বইটি আমাকে উপহার দেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে টুকিটাকি দু'একটি প্রবন্ধ ছাড়া ওয়ালীউল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো লেখার খোঁজ কেউ দিতে পারেন নি। চট্টগ্রামে স্নেহভাজন অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশীর কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে পারী শহরের উপান্তে ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্ত্রী অ্যান-মারি থিবোর সঙ্গে ১৯৭৫-এর মে মাসে আমার স্ত্রী গীতা এবং আমি দেখা করি। অ্যান-মারি 'লালসালু'র ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন; এই তর্জমা ১৯৬১ সালে পারী থেকে L'arbre sans racine নামে প্রকাশিত হয়; কিছুটা পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় ফরাসী সংস্করণ বেরোয় ১৯৬৩ সালে। 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদেও অ্যান-মারি সহায়তা করেছিলেন; এটি ১৯৬৭ সালে Tree Without Roots নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক হিসেবে অ্যান-মারির সঙ্গে কাইসার সায়েদ, জেফ্রি গিবিয়্যান ও মালিক খায়ম-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

ওয়ালীউল্লাহ্‌-র জীবনের প্রথম পর্ব সম্পর্কে অ্যান-মারি বিশেষ কিছু বলতে পারেন নি। ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ দুই বছর অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে পাকিস্তান দূতাবাসে প্রেস-অ্যাটাশে পদে নিযুক্ত ছিলেন। অ্যান-মারিও ঐ সময়ে ফরাসী দূতাবাসে কাজ করতেন। পরিচয় থেকে ভালবাসা; ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে করাচীতে তাঁদের বিয়ে হয়। যদিও বিয়ের আগে অ্যান-মারি ধর্মান্তরিত হয়ে নাম নেন আজিজা মোহাম্মদ নাসরিন এবং ইসলাম ধর্মমত অনুসারেই তাঁদের শাদি হয়, একমাত্র কাবিননামায় ছাড়া আর কোথাও তিনি এ নাম ব্যবহার করেন নি। তাঁর কথা থেকে এবং ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাদি থেকে সন্দেহ থাকে না যে অস্তিত্বের রহস্যবিষয়ে জাগ্রতচিত্ত কিন্তু যুক্তিবাদী ওয়ালীউল্লাহ্‌ কোনো প্রচলিত বিশেষ ধর্মমতে আস্থাশীল ছিলেন না।

১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ওয়ালীউল্লাহ্‌ তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দূতাবাসে কাজ করেছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ইউনেস্কোতে চাকরি নেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের চাপে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর এই চাকরিটি যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি পারী শহরে বসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে পশ্চিমে জনমত গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন। বাংলাদেশের সপক্ষে ১৯৭১ সালে জয়প্রকাশ নরায়ণের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে দিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় তাতে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে তিনি আঁদ্রে মালরো এবং জাঁ-পল সাত্র-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, মানসিক পরিশ্রম তাঁকে ভিতর থেকে জীর্ণ করে ফেলেছিল। ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর গভীর রাতে এই প্রতিভাবান শিল্পী উনষাট বছর বয়সে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যান।

> ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাংলা ভাষায় আমাদের সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। যে সময়ে পশ্চিম বাংলায় বাজারী অভিযাচনার চাপে উপন্যাস মননবিমুখ ফচকেমি, ন্যাকামি আর গালগল্পে পর্যবসিত হতে চলেছে সে সময়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিবেকী শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় হয়ত এখানকার কিছু লেখক ও পাঠকের মনে বাংলা উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি ও সামর্থ্যে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেও আনতে পারে।

অ্যান-মারির সঙ্গে যখন আমরা দেখা করতে যাই তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বালকপুত্র ইরাজ। অ্যান-মারির কথা থেকে জানা গেল যে ফ্রান্সে ওয়ালীউল্লাহ্‌-র নিজের বিশেষ বন্ধুবান্ধব ছিল না; বিদগ্ধ, নির্লোভ, নায়কোচিত চরিত্র ও রূপসম্পন্ন এ মানুষটি গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না; বিস্তর পড়তেন, এবং লেখা ছাড়াও ছবি আঁকতেন। তাঁর আঁকা কিছু ছবি বেলভ্যু-র ফ্লাটে আছে। 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) এবং 'দুইতীর' (১৯৬৫)– তিনটি বইয়ের প্রচ্ছদ লেখকের নিজের আঁকা। কাঠের কাজেও নিপুণ ছিলেন; নিজের ব্যবহারের জন্য অনেক আসবাবপত্র নিজেই তৈরি করেছেন। পারীতে দশ বছর বাস, ফরাসী স্ত্রী, ইয়োরোপীয় জীবনযাপন মুখ্যত পশ্চিমী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ চর্চা, ইংরেজিতে সরকারি বেসরকারি চিঠিপত্র-প্রতিবেদন ইত্যাদি লেখা সত্ত্বেও তাঁর মন বেশির ভাগ সময় নদীনালা, সুপারি-নারিকেল, ধানক্ষেতের স্মৃতিবিজড়িত বাংলাদেশের জন্য ব্যাকুল বোধ করত।

পারী থেকে ফিরে মেলবোর্ন থেকে চিঠি লিখি শামসুর রাহমান প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুর কাছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন সংক্রান্ত তথ্য ও উৎসাদির খোঁজ করে। যেটুকু অল্পস্বল্প খবর পাই তার ভিত্তিতে তাঁর তিনটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ইংরেজিতে একটি খসড়া-আকারের প্রবন্ধ পাঠকেরি বিদেশী সাহিত্যিকদের একটি বৈঠকে; পরে কলকাতায় তাঁর বিষয়ে দু'একটি অনুষ্ঠানে বলি। কিন্তু তখনো মনে হয়েছিল, এবং মকসুদ সাহেবের অধ্যবসায়ী ও মূল্যবান গ্রন্থটি পড়বার পরও মনে হয়েছে তাঁর সম্পর্কে প্রামাণিক কিছু লেখবার জন্য যেসব তথ্য এবং উৎস অবশ্য প্রয়োজন (চিঠিপত্র, রোজনামচা, বিভিন্ন লেখার প্রাথমিক খসড়া) তা এখনো সংগৃহীত হয় নি। সৈয়দ আবুল মকসুদ অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ। তবু যে এই আলোচনাটি লিখছি তর প্রথম উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যানুরাগীদের মনে ওয়ালীউল্লাহ্‌-র রচনাবলী বিষয়ে আগ্রহ গড়ে তোলা যাতে কোনো উদ্যোগী প্রকাশক ঐ রচনাবলী সংগ্রহ করে কলকাতা থেকে তার একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বার করেন. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, বিলম্বে হলেও তাঁর অসামান্য সাহিত্যকৃতির প্রতি প্রকাশ্যে লিখিতভাবে বাংলায় আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনের প্রথম পর্ব বিষয়ে মকসুদ সাহেবের বই এবং অন্যান্য সূত্র থেকে মোটামুটিভাবে এটুকু জানা যায় : ১৯২২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের এক শহরতলীতে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ আহমদউল্লাহ্‌, মার নাম নাসিম আরা খাতুন। মা ও বাবা দুজনেই বিত্তবান ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সন্তান। মা অল্পবয়সে মারা যান (১৯৩০), বাবা আবার বিয়ে করেন। বাবা সরকারি চাকরি করতেন; তাঁকে পূর্ব বাংলার নানা জায়গায় প্রশাসনিক কাজে যেতে হত; কৈশোর কলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাই বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। বি.এ পাশ করেন মংমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে। তারপর কলকাতায় আসেন এবং অর্থনীতি নিয়ে এম.এতে ভর্তি হন। কিন্তু নিয়মিত ক্লাস করেন নি, পরীক্ষাও দেন নি। ১৯৪৫-এ স্টেট্‌সম্যান দৈনিক পত্রিকায় যোগ দেন এবং দেশ বিভাগ পর্যন্ত সেখানেই কাজ করেন। তারপর রেডিও পাকিস্তানে যোগ দিলে প্রথমে ঢাকা, পরে করাচী। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান দূতাবসে বিভিন্ন পদে কাজের কথা অ্যান-মারির কাছে আগেই শুনেছিলাম।

কলকাতায় যে চার বছর ছিলেন সেই সময়ে তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল' ও 'পূর্বাশা' সাহিত্য-পত্রে প্রকাশিত হয়। পূর্বাশা লিমিটেড থেকে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি। 'সওগাতে' প্রকাশিত বাইশটি, মাসিক মোহাম্মদীতে

প্রকাশিত পাঁচটি এবং দ্বিমাসিক 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার তালিকা দিয়েছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর বইটিতে; এদের ভিতরে অগ্রন্থিত অনেকগুলি লেখা মকসুদ তাঁর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সম্ভবত কলকাতায় থাকাকালেই খসড়া আকারে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' লেখা শুরু হয়; এটি শেষ করেন ঢাকায় এবং সেখান থেকেই লেখকের খরচায় প্রকাশিত হয়। মকসুদ জানিয়েছেন যে 'প্রথম সংস্করণ বিশ-পঞ্চাশ কপি বিক্রি হয়ে থাকতে পারে, অবশিষ্ট সমুদয় কপি সের দরে ওজন করে বেচে দেয় বাঁধাইখানার লোকজন'। ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় এবং পরের বছর ওয়ালীউল্লাহ্ এই বইয়ের জন্য বাংলা একাডেমি থেকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে পুরস্কৃত হন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' নিয়ে গোড়াতে আলোচনা করেছি। তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' বেরোয় ১৯৬৮ সালে। তাছাড়া ১৯৬০ সালে তাঁর নাটক 'রহিনী', ১৯৬৪ সালে তাঁর নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' ও একটি কিশোরকিশোরীদের জন্য রেখা' নটক 'সুড়ঙ্গ' এবং ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর' প্রকাশিত হয়। [এই গল্পসংগ্রহটির নাম ওয়ালীউল্লাহ্ দিয়েছিলেন 'স্তন', কিন্তু সম্ভাব্য ক্রেতা, কি মহিলা কি পুরুষ, ঐ নাম ধরে বই চাইতে লজ্জা পাবে আশঙ্কা করে প্রকাশক লেখকের সম্মতি নিয়ে বইটির নাম পালটে দেন।] এই বইগুলি, মকসুদের বইয়ের দুইখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত কবিতা-ছোটগল্প-চিত্রসমালোচনা- পত্রগুচ্ছ ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু এতাবৎ অগ্রন্থিত কিছু বাংলা লেখা ছাড়াও তিনি ইংরেজিতে তিনটি বই লিখেছিলেন— এগুলি এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত। এদের ভিতরে আছে 'চাঁদের অমাবস্যা'র একটি ইংরেজি অনুবাদ; নাম No Amaranth.

যদিও স্বভাবের দিক থেকে ওয়ালীউল্লাহ্ সামাজিক ছিলেন না কলকাতায় থাকবার সময়ে বেশ কয়েকজন ভাবুক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছিল। সম্ভবত এই সময়েই ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে তাঁর মনের মুক্তি ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কাজী আবদুল ওদুদ ও আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসু, শাহেদ সুহরাওয়ার্দী, গোপাল হালদার, শওকত ওসমান, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে তাঁর কম বেশি হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না হয়ে থাকলেও পরে শুনেছি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কিছু সহকর্মীর সঙ্গে ঐ সময়ে তাঁর ভাবনার আদান হয়েছিল। কোনো রাজনৈতিক দলের তিনি কখনো সদস্য হন নি, কিন্তু তাঁর প্রতিন্যাস ছিল যুক্তিবাদী ও সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। সুহরাওয়ার্দী ও শরৎ চন্দ্র বসুর প্রস্তাবিত 'স্বাধীন সংযুক্ত বাংলা' গঠনের দাবির যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। তিনি একই সঙ্গে বাংলাকে ভালবাসতেন এবং সংস্কৃতির দিক থেকে ছিলেন বিশ্বনাগরিক। বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের দশকের গোড়ায় ঢাকায় অধ্যাপক আবুল হুসেনের নেতৃত্বে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সৃজনধর্মী সাহিত্যে তারই উত্তরাধিকারকে ফলপ্রসূ করেছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। আমার ধারণা সমকালীন বাংলাদেশের সাহিত্যমানস গড়ে তোলায় তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

চার

'চাঁদের অমাবস্যা' যদিও তাঁর শেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম, তাঁর অন্য দুটি উপন্যাসে এবং কিছু ছোটো গল্পে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মোটেই অপ্রতক্ষ্য নয়। প্রথম সংস্করণে 'লালসালু'র পাঠক জোটেনি; কিন্তু পরে এটির অনেকবার মুদ্রণ হয়েছে। উর্দু, ইংরেজি ও ফরাসী ছাড়াও চেক এবং সম্ভবত আরো কয়েটি পূর্ব ইয়োরোপীয় ভাষায় এই উপন্যাসটির অনুবাদ ছাপা হয়। ইংরেজি ও ফরাসী অনুবাদে মূলের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখা যায়; বাংলা সংস্করণে (অষ্টম মুদ্রণ : জুলাই, ১৯৭৩) যেখানে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৬, ফরাসী অনুবাদে সংস্করণে সেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০, এবং ইংরেজি অনুবাদে পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৩। সৈয়দ আবুল মকসুদ মূল বাংলা সংস্করণ এবং ইংরেজি অনুবাদ সংস্করণের পার্থক্য নিয়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ : ১১১-১৫০) আলোচনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে যদিও অনুবাদক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্র নাম ইংরেজি ও ফরাসী সংস্করণে উল্লিখিত হয়নি, এইসব ঘসামাজা বাড়ানো বদলানো লেখক নিজেই করেছিলেন; এ কাজ অনুবাদকের সাধ্যায়ত্ত নয়। মকসুদের এই সিদ্ধান্ত সংগত বলেই মনে হয়।

স্বভাবের দিক থেকে ওয়ালীউল্লাহ্ সামাজিক ছিলেন না কলকাতায় থাকবার সময়ে বেশ কয়েকজন ভাবুক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছিল। সম্ভবত এই সময়েই ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে তাঁর মনের মুক্তি ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কাজী আবদুল ওদুদ ও আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসু, শাহেদ সুহরাওয়ার্দী, গোপাল হালদার, শওকত ওসমান, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে তাঁর কম বেশি হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল।

'লালসালু' মজিদ ও মহব্বতনগর গ্রামের কাহিনী। মজিদ 'খোদার আলো ছড়াতে' এবং ভাগ্য ফেরাবার আশায় গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে কিছুকাল কাটিয়েছিল। সুবিধা করতে না পারায় তিনদিনের পথ হেঁটে সে মহব্বতপুর গ্রামে পৌঁছয়। সেখানে একটা বড় বাঁশঝাড়ের কাছে মজাপুকুরের পাশে পুরানো একধারে টালখাওয়া কালো সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা ছোট ছোট ইটের তৈরি একটি কবর দেখে সে একটা মতলব ঠাওরায়। সে ঘোষণা করে "ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার । গ্রামবাসীদের ধমকে, অলৌকিক শক্তির ভয় দেখিয়ে, তাদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, দুর্বলতা, আত্মনির্ভরতার অভাব এবং পরিবেশের বিমুখতার সুযোগ নিয়ে মজিদ ক্রমে নিজেকে ঐ গ্রামের একচ্ছত্র ধর্মীয় নেতার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। গ্রামের প্রতিপত্তিশালী জোতদার খালেক ব্যাপারীও ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে মজিদের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং দুজনের ভিতরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মজিদ জানে তার প্রভাব প্রতিপত্তির উৎস সেই কবর যেটা কার কবর সে জানে না কিন্তু যেটাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে ধর্মভীরু গ্রামবাসীর সে বিশ্বাস করিয়েছে। ইটসুরকী দিয়ে নতুন করা হয় মাজারকে, তার ওপরে ঝালরওয়ালা লালসালু কাপড়ে দেখায় মাছের পিঠের মত, মোমবাতি জ্বলে, আগরবাতি গন্ধ ছড়ায়, এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে লোকেরা এসে তাদের কান্না, কৃতজ্ঞতা, আশা, ব্যর্থতার কথা নিবেদন করে, আর সঙ্গে ছড়াছবি যায় পয়সা, সিকি, দুয়ানি, আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা।

মজিদের ঘরবাড়ি ওঠে, এক 'ব্যপ্তযৌবনা' শক্তসমর্থ মেয়েকে 'আলিঝলি' 'দূর থেকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে শীর্ণদেহে মজিদ তাকে বিয়ে করে; পরে বুঝতে পারে যে রহীমা ভারি 'ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ', রোগা বুড়োটে মজিদের 'পেছনে মাছের পিঠের মত মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে' মজিদকে যেমন সে ভয় তেমনি শ্রদ্ধা করে। গান, হাসি, আনন্দ, উৎসব, এসবের মজিদ একেবারে বিরোধী। বয়স্ক জোয়ানদের ধমকে কলমা পড়ায়; এক বাপ বেটাকে জবরদস্তি পাকড়াও করে হাটবাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে খৎনা দেয়; জমায়েত ডেকে এক বদমেজাজি বুড়োকে খোদার নামে এমনভাবে তার মনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় যে সে চিরকালের মত ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। মজিদের ঘরে মগড়ার পর মগড়া উপচে পড়ে ধানের প্রাচুর্যে। মজিদ অনুভব করে তার শক্তি খালেক ব্যাপারীর শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে মাজারটি তার শক্তির সূত্র।'

মজিদের এই একচ্ছত্র ক্ষমতায় প্রথম ধাক্কা লাগে তিনগ্রাম পরে এক পীর সাহেবের আগমনের ফলে। লোকজন পীরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে 'একটা মারাত্মক ক্রোধ-ঘৃণা মজিদের রক্তে টগবগ করতে থাকে।' তারপর মজিদ মাথা ঠাণ্ডা করে পীরের ধাপ্পাবাজি ধরিয়ে দেবার মতলব আঁটে। তার চেষ্টা অংশত সফল হয়; তার গ্রামের কিছু যুবক 'জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে' পীর সাহেবের সভায় গিয়ে হামলা করে। কিন্তু সংখ্যায় কম বলে তাদেরই মাথা ফাটে, তাদেরই হাসপাতালে যেতে হয়। তারপর মজিদ দেখে খালেক ব্যাপারীর নিঃসন্তান

প্রথম বিবি আমেনা সন্তান কামনায় পীরের থেকেই পানিপড়া চায়। মজিদ তখন বিস্তর মাথা খাটিয়ে নানা কাল্পনিক তত্ত্বের উদ্ভাবনা ও অনুষ্ঠানবিধির ব্যবস্থা করে ব্যাপারীকে বোঝায় যে আমেনা বিবির গুণাগার দিল থেকে খালেকের পাক দিল বিচ্ছিন্ন না করতে পারলে খালেকের অশেষ শাস্তি সুনিশ্চিত। 'খোদার কালামের সাহায্যেই' মজিদ একথা জেনেছে। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাপারী তার নিরপরাধ 'ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু' বিবিকে চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

বিদেশপ্রত্যাগত 'উচক্কা ধরনের ছেলে' যুবক আব্বাসের স্কুল খোলার প্রস্তাবকে কৌশলে বানচাল করে দিয়ে মজিদ তার জায়গায় গ্রামে এক পাকা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি করায়। 'কিন্তু চিত্তপ্রতিপত্তি খোদার কালাম সত্ত্বেও মজিদের মনে শান্তি নেই। তার কোনো পোলাপাইন নেই এবং ঠাণ্ডা, ভীতু রহীমকে নিয়ে তার দেহের কামনা মেটে নি।' গ্রাম্যক্ষমতার চূড়ায় বসে মজিদ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। জমিলাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল 'সে যেন ঠিক বেড়ালছানা'। কিন্তু দিন কয়েককের মধ্যেই বোঝা যয় কিশোরী জমিলার প্রকৃতি রহীমার একেবারে বিপরীত। সে যখনতখন জোরে হেসে ওঠে; দুঃখীর দুঃখে তার মনে 'কুলকিনারাহীন অথই প্রশ্ন' জাগে, নামাজ পড়তে ভুলে যায়; মজিদের ধমকধামক গ্রাহ্য করে না; এমনকি যখন মগরেবের পরে দোয়াদরূদ পাঠের শেষে জিকির করতে করতে মজিদ উদ্বেল জমায়েতের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন বিভ্রান্ত জমিলা সব রীতিনিষেধ ভুলে বাইরে গাছতালায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে— তার মাথায় ঘোমটা নেই। মজিদের জ্ঞান ফেরে, কিন্তু জিকির আর জমে না। পরদিন মজিদ পীরের মাজার সম্পর্কে জামিলাকে অনেক বানোয়াট ভয়ঙ্কর গল্প বলে; তাকে হুকুম দেয় রাতে নামাজ পড়ে মাজারের পরীরের কাছে মাফ চাইতে। কিন্তু রাতে খুঁজতে এসে দেখে জামিলা জায়নামাজে ঘুমিয়ে আছে। তাকে হ্যাঁচকাটানে তুলে মজিদ মাজারের দিকে নিয়ে যায়। মাঝপথে জমিলা বেঁকে বসে, হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে— "হঠাৎ সিধে হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিক করে তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করলো।" স্তম্ভিত মজিদ সন্ত্রস্ত রহীমার দিকে চেয়ে 'অদ্ভুত গলায় বললো : হে আমার মুখে থুতু দিলো।'

কিন্তু একে উদ্যোগী, শক্তিমান, মাতব্বর পুরুষ, তায় খোদায় কালামের সহায়তায় প্রায় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, কিশোরী বউয়ের বিদ্রোহে ঘাবড়াবার লোক মজিদ নয়। তাকে পাঁজাকোলে করে মাজারে নিয়ে যায়, সেখানে একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে জমিলার কোমর বাঁধে, তারপর মাজার ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে নিজের বাড়িতে চলে আসে। সে রাতে ভয়ঙ্কর ঝড় ওঠে, তারপর অজস্র শিলাবৃষ্টি। রহীমা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে; মজিদ ছটফট করে; শিলাবৃষ্টি থামতেই মাজারে যেয়ে ঝাঁপটা খুলে দেখে লালসালু ঢাকা কবরের পাশে 'হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই।' মজিদ দড়ি খুলে তার অচেতন দেহ তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। 'মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে। কিন্তু যে পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।' মাঠে বেরিয়ে দেখে 'ক্ষেতে ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। ... চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।'

'চাঁদের অমাবস্যা'র মত 'লালসালু'র শৈলী অতটা সূক্ষ্ম নয়; ব্যঞ্জনাশ্রিত আভাসের চাইতে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিন্যাসের স্পষ্টতা এই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু দুই উপন্যাসেই গভীর অর্ন্তদৃষ্টি ও অশিথিল একাগ্রতায় ধীরে ধীরে প্রধান চরিত্র দুটি প্রমিতাক্ষরিত। 'চাঁদের অমাবস্যা'য় বস্তুত কোনো স্ত্রী চরিত্র নেই; 'লালসালু'তে শুধু বিদ্রোহিনী জমিলা নয়, সন্ত্রস্ত সেবাব্রতী ও স্নেহপরায়ণ রহীমা, স্বামীভীরু আমেনা, বিধবা ধানভাননী হাসুনির মা ('শরীলে যার রং ধরেছে) এবং তার ঝগড়াটে 'ছোটখাটো, কোঁকড়ানো' মাবুড়ী প্রত্যেকেই জীবন্ত। তাছাড়া এ উপন্যাসটিতে মাজারপীরমোল্লাশাসিত মুসলমান গ্রামসমাজের পরিচয় মেলে। জীবনের অনিশ্চয়তাজাত ভয় এবং অলৌকিক বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে বিত্তসম্বলহীন কিন্তু অভিনয়দক্ষ ও চতুর উদ্যোগীজন যে কীভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, খোদার কালাম যে তার ব্যবসায়ে কতবড় পুঁজি হয়ে উঠতে পারে, বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌র আগে আর কেউ কাহিনীর ভিতর দিয়ে এত অনাবিদ্ধ দুঃসাহসে সেটি ফুটিয়ে তুলেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 'অহিংসা' উপন্যাসের (১৯৪১) উৎকর্ষ লক্ষ করবার পরও আমার মনে হয় 'লালসালু'র ধীপ্রদীপ্ত, অনন্যতন্ত্র সাহসিকতার তুলনা সেখানেও মেলে না। আসলে হিন্দু আশ্রমগুরুদের চরিত্র বিশ্লেষণের চাইতে মুসলিম পীরমোল্লাদের চরিত্রবিশ্লেষণ যে কোনো বাঙালি লেখকের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক। শুধু সার্থক উপন্যাস হিসেবে নয়, শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের সমকালীন মানসমুক্তির প্রচেষ্টার ইতিহাসেও 'লালসালু' বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' তাঁর প্রথম উপন্যাস দুটির চাইতে গঠনের দিক থেকে জটিলতর, বক্তব্যের দিক থেকে আরো গূঢ় এবং কিছুটা অস্বচ্ছ। এটিতে একদিকে আছে নিপুণ বিশৃঙ্খলায় কথিত মুহাম্মদ মুস্তাফার বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী, অন্যদিকে কুমুরডাঙ্গার অবক্ষয়ের বিবরণ। কথক তবারক ভুইঞার জবান অনুসারে 'পরের জীবনের দিকে তাকিয়ে দিন কাটিয়েছি, নিজের জীবনের কথা ভাবার সময় হয়ে ওঠে নি। বালক বয়সে বীর্যস্খলনের রাতে তার নির্দয় পিতা তাকে প্রচণ্ড প্রহার করেছিল, অনতিক্রমণীয় আতঙ্ক মুস্তাফার জীবনের রন্ধ্রেরন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত; সে সইতে শিখেছে, করতে শেখেনি; শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করে। কুমুরডাঙ্গার সঙ্গে মুস্তাফার সর্ম্পক এই যে দেশের বাড়িতে ফিরে আত্মঘাতী হবার আগে সে কুমুরডাঙ্গায় ছোট হাকিম হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল। যে নদীর পারে কুমুরডাঙ্গা সেখানে চড়া পড়ার ফলে কুমুরডাঙ্গাতে স্টিমার আসা বন্ধ হয়ে যায়। কুমুরডাঙ্গার লোকদের মনেও কি একটা সদাজাগ্রত ভয়। যেন খোদাকে নয় খোদার সৃষ্টিকে তাদের ভয়। দোজখকে নয় নশ্বর জীবনকে তাদের ভয়'। 'সর্বপ্রকার মছিবতের জন্য তারা সদা-তৈরি, এং একবার কোনো মছিবত এলে তার অস্তিত্ব বা নায্যতা নিয়ে কোনে প্রশ্ন তোলে না'। স্টিমার চলাচল বন্ধ হবার পর মোক্তারের মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সখিনা খাতুন 'একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়'। 'কান্নাটি কোনো মানুষের নয়, কোনো জীবজন্তুর নয়, জীবিতের নয়, মৃতেরও নয়, অন্য কারো। কে জানে, কান্নাটি হয়তো নদীরই, হয়তো তাদের মরণোন্মুখ বাকাল নদীই কাঁদে।' ক্রমে কুমুরডাঙ্গার আরো অনেকে এই রহস্যময় কান্না শুনতে পায়। তারা তখন সবকিছুতেই 'আসন্ন ভীষণ বিপদের পূর্বচিহ্ন দেখতে পায়, তাদের জীবন হয়ে দাঁড়ায় 'শ্বাসরুদ্ধকরা অপেক্ষা মাত্র'। কুমুরডাঙ্গা এবার যেন মধ্যস্থলে প্রত্যাবর্তন করেছে।'

মুস্তাফা ও কুমারডাঙ্গা দু'এর কাহিনীই আমাদের অভিভূত করে। কিন্তু এই উপন্যাস যে কাহিনীমাত্র নয় সূচনা থেকেই তা স্পষ্ট। এখানে ব্যক্তিগত ও সামূহিক মর্তুকাম বৃত্তির সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক পরিপ্রেক্ষণ পদে পদে আমাদের ভাবায় আমাদের ভোগবৃত্ত পঠনকে নানা প্রশ্নের দ্বারা উদ্দীপিত করে। কুমুরডাঙ্গা কি তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু পূর্ববাংলার প্রতীক, অথবা আধুনিক সভ্যতার মৃত্যুমুখিনতার অথবা মানুষের অস্তিত্বিক অর্থহীনতার ? মনে হয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিঠিপত্র ডায়েরি ইত্যাদি পাওয়া গেলে এই উপন্যাসটির নিগূঢ়ার্থ স্পষ্টতর হতে পারে।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক ছোটগল্প নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। বস্তুত এ লেখাটি প্রস্তাবন মাত্র। তাঁর 'বহিপীর' নাটকের অভিনয় আমি দেখেছি কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর কৃতি যেমন অসামান্য নাট্যকার হিসেবে তেমন উল্লেখ্য বলে আমার অন্তত মনে হয় নি। অপরপক্ষে তাঁর বে কয়েকটি ছোটগল্প বিস্তারিত আলোচনার দাবি করে। তাঁর শ্রেষ্ঠগল্পগুলিতে তন্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, অন্তর্মুখভাবনা ও ইঙ্গিতঋদ্ধ কল্পনা দুর্লভ সংযুতি রচনা করেছে সৌভাগ্যবশত 'নয়নচারা' ও 'দুইতীরের' গল্পগুলি একটি সংকলন কলকাতায় খোঁজ করলে পাওয়া যায়; শুকসারী নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৭১ সালে এই 'গল্পসমগ্র' প্রকাশ করেছিল।

সব মিলিয়ে সন্দেহ নেই ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাংলা ভাষায় আমাদের সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। যে সময়ে পশ্চিম বাংলায় বাজারী অভিযাচনার চাপে উপন্যাস মননবিমুখ ফচকেমি, ন্যাকামি আর গালগল্পে পর্যবসিত হতে চলেছে সে সময়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিবেকী শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় হয়ত এখানকার কিছু লেখক ও পাঠকের মনে বাংলা উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি ও সামর্থ্যে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেও আনতে পারে।

জন্ম শতবার্ষিকীর আগমুহূর্তে

মোহাম্মদ রফিক

এতদিন অন্যত্র ওড়উড়ি সেরে;—

ধানসিড়ি জোয়ার-ভাটায় ডুব দিয়ে উঠে এলো শঙ্খচিল,
ঢেউসিঁড়ি ভেঙে ভেঙে

ঘরে ফিরলে, রাত না-নামতেই ফেরা ভালো—

সাঁঝসন্ধে বেলাবেলি কলেজপাড়ার মোড়,
আকন্দজিয়লকচাঝোপ রিক্সা মুখবাতি ঠেসাঠেসি
ছেড়ে, পোল পেরিয়ে; দক্ষিণ মুখো সদর রাস্তায়,

অনেকটা যেমন হাঁটতেন ১৯৪৭-এর জানুয়ারি,

পাড়ি ধরে সিংহল সমুদ্র থেকে অন্ধকার মালয় সাগর,
এই বেশি দূর নয়, ড্রেনের দুর্গন্ধ কাঁঠালের ভুতি, খোসা,
গোরুগাড়িচাকা, ট্রাক, মোটরকারের কাশি কৌশলে এড়িয়ে
ঠেলে ঠেলে স্টিমার ঘাটায় পৌঁছতে না-পৌঁছতেই
প্রাণান্ত ঈষৎ ভেজা ভেজা,

শেষমেশ কেউ কি কোথাও পৌঁছে ?

বেহুলার কাল ছুঁই ছুঁই ততোদিনে লখীন্দর চড়ে নি ভেলায়
ধনপতি শ্রীমন্ত লহনা এরা সব চেনা-বা-অচেনার মুখ
সারি সারি, যে বালক একাত্তরে গুলিবিদ্ধ ঝাঁপ
দিলো কীর্তনখোলায়,

দেখা হ'য়ে গেলো বাঁক ফিরতে বিবি পুকুরের
পাড় ঘেঁষে চেনা চেনা মনে হলো আগুনের রঙে
উজ্জ্বল বা পুড়ছে ধিকিধিকি বা নিভেও নিভবে না
দুটো চোখ

এত পরিচিত আলো আঁধারিতে কে-বা খোঁজ নেয় ব্রাহ্মমন্দিরের,

সদানন্দ ভবনের চিহ্নটুকু ডানে রেখে
যদি দেখা হ'য়ে যায়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে, বনলতা সেন
সুরঞ্জনা বিদিশা সবিতা পিতৃবন্ধু সুবিনয় মুস্তাফী ত্রিবেদী অনুপম,
এঁদের যে কারো সঙ্গে,

বলে উঠবে কি কাঠ-ঠোকরানো চেনা স্বরে, 'এতোদিন কোথায় ছিলেন...'
বিশেষত এই অনাত্মীয় ওপড়ানো পরিস্থিতি
বিশেষত দেশভাগ সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গা বিমুক্ত বাজার...

কত টা বা পাল্টিয়েছে প্রত্যেকে, কঠিন বলা, অবশ্য সে টের
পেয়েছিল, এরা কী ক'রে যে টের পায়—

তবে এই বাতাসে বারুদ গন্ধ ধর্ষণ সন্ত্রাস
যেন প্রায় এক-একটা গণ-আন্দোলন—
পাখির নীড়ের মতো ড্যাবড্যাবা বিস্ময়বিমূঢ় চোখ
ঘুরে ফিরে সলতে টানছে তেলশূন্য টেমি—

সেই ভয়ে দরজা জানালা একে একে বন্ধ হ'তে শুরু
এক দূর আত্মা ঢুকে গেছে শহরের পাঁজর উজিয়ে
যে কারো মতন নয় দেখে ফেলে প্রত্যেকটি মুদ্রাদোষ...
তিনি তো নিজেই লিখেছেন, 'আবার আসিব ফিরে...'
কে না জানে

আপাতত এই সব অমার্জিত নপুংসক
গবেষণা ফোকর গলিয়ে
ততক্ষণে ওই দেখো মর্মভেদী দুটো চোখ
কত পথ চিনে চিনে কীর্তনখোলার ঘাটে, অন্ধকারও জমেছে কুয়াশা ঘোর,
শিশির চাপিয়ে চতুর্দিকে নিরিবিলি শুনশান...

গুনছে ঢেউ, সেখানে কি মুখ দেখছে পঞ্চমীর চাঁদ...
কী চমৎকার, ফের ধরা হবে দু'একটা ইঁদুর এবার...

রমানাথ বিশ্বাসের অশ্বটি তখনও পাড়ি দিতে পারে নি পাহাড়, তেপান্তর...

যদিও এরই মধ্যে দু'তিনটে যুদ্ধ গেছে,
মা তার শরম নিজে জড়িয়ে নিয়েছে লাল সবুজ পতাকা
বলতে হয়, বেশিটাই লেবুপাতা লালরক্ত ধোয়া...

হঠাৎ সে ডেকে উঠলো, এই তো প্রথম, ফাটা চী-চীৎকারে,
কণ্ঠস্বর তিক্ত ও কর্কশ,
গলাভর্তি শ্লেষ্মা ও ধিক্কার, আত্মঅপমানবোধ
(যা জমেছে এই কবিতাটি লেখার বেঘোরে,
অর্থাৎ কাউনিয়া হ'য়ে স্টিমার ঘাটায় পা না দিতে)

পৃথিবীর সব কাক ডাকতিছে...
মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও...

শিকারী চোখের মতো বর্শা শেল গ্রহ-নক্ষত্রের অনিশ্চিত ঘণ্টাবাজে মধ্যরাত;
ফের শঙ্খচিল পা বাড়ায় ধানসিড়ি যেদিকে যেপথে
তবে ঢেউসিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আট/দশ মাত্রার বিন্যাসে নয়...
নাভিশ্বাস... অজানা শঙ্কার, ঢিপঢিপ...

মানুষের সাহচর্য কি এতই আকাঙ্ক্ষিত মধু
গলায় ঢাললেও গলা জ্বলবে না
আদ্যপান্ত চেপে ধরবে না হাড়মাস

যদি কেউ শুনতে পায়
সেই স্বরভাঙা কাচ জলের ঢেউ-এর মতো
ফিরে ফিরে ধারালো প্যাঁচালো অন্তস্রাবী...

কথা কয়... এই বোধ ... অভ্রভেদী...

বিস্ফোরণ শব্দে চতুর্দিক ফেটে পড়ছে সবুজ ফড়িং-রঙা ভোর
কচি লেবু-পাতার মতন ঘাস ছাড়িয়ে, মাড়িয়ে

ভোঁ ভোঁ প্যাঁ প্যাঁ তেড়ে আসে যন্ত্র ও দানব... ধর ধর ব্যাটা কবি ধর,

যা ছাপা যা লেখা নেই তা ওদের তো জানার কথা নয়—
চলো, ওই ওইসব অধ্যাপক গবেষক প্রকাশক, ঘুম থেকে ওদের জাগিয়ে তোলা যাক...

সচিত্রকরণ : সমর মজুমদার

আঠালো পিঁচুটি গোলা চোখগুলো সব জুলজুল করে উঠবে ফের
যত্তসব লক্ষ্মীপেঁচা যার যার কোটরে ঢোকার...

কিংবা ইঁদুরের গর্তগুলো চিনে ফেলার পূর্বেই...

গায়ত্রীমন্ত্রের সূর্য যপতপ থামিয়ে দেখলেন, কী আশ্চর্য,
একটি শঙ্খচিলের লাশ একটি বালক
টেনে নিয়ে যাচ্ছে হিড়হিড় ধানসিড়ি তীর বেয়ে
কিন্তু খবরটা তিনি কী করে জানাবেন, কাকেই বা জানাবেন,

এরকম প্রতিদিনই ঘটে, ঘটতে পারে
কারও না কারও লাশ কেউ না কেউ তো টেনে নিয়ে চলে...

কেন না নিজের মৃত্যু প্রত্যেকে নিজেই মরে... তার সাধ হলে মরিবার তরে...
তাকে ফিরে যে আসতেই হবে... সূর্যও কি জেনে গেছে...

এর ফাঁকে দুটি স্তবকের মাঝামাঝি একটু থেমে
ব্যাপটিস্ট মিশন রোডের দু নম্বর জানলার পর্দা ঠেলে
ঘাড়টা বাঁকিয়ে দেখে নিতে হয় বার বার...

ব্যক্তিগত লাশকাটা ঘরেরই বা কী খবর...
ঘুরে যাবে কী মর্গের ওপাশটা জেনে নিতে... কে কেমন আছে...

এতবার 'ফিরে' শব্দ ফিরে ফিরে ব্যবহৃত হ'লো... ঠেকানো গেলো না... তবুও তো
ধাঁধার অন্তরে ধাঁধা... কেউ কি যথার্থ ফেরে ফিরতে পারে... সম্ভব হলেও...

খুঁজি, যে লেখাটি নেই তাঁর 'কবিতাসমগ্রে'।
কতোটা বয়স বাড়ছে তার প্রতিদিন...

ঢেঁকি-বৃত্তান্ত

শওকত আলী

বলছ তুমি এ কী ?
বাংলাদেশে কোথাও নেই
ধান ভানবার ঢেঁকি ?

তাই তো খুঁজে দেখি
তোমার কথা ষোল আনাই ঠিক
একটুও নয় মেকি।

চাষীর ঘরে খাঁ খাঁ উঠান
ধনীর হাতে লোপাট ধান
উধাও পান,
গাইছে না কেউ আর
সাঁঝ বেলাতে পিদিম জ্বেলে
পৌষ পাবনের লক্ষ্মীমন্ত গান।

শুনছি নাকি ধানের কলে কাজের খোঁজে
বউ ঝিরা সব টাউনে গেছে
এখন কে-ই বা করে কী ?

গাঁও গেরামে দেখতে পাবে
ঢেঁকিশালে আড্ডা মারে
শেয়াল যতো খেঁকি!

প্রতিচ্ছায়া

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

১.
এমন নিঃশব্দের নান্দনিকতা আমরা কি পেয়েছিলাম!
বিনিময় নেই। বৃষ্টি দৌড়ে চলে গেল পাহাড় পেরিয়ে।
ঘরের সমুদ্রে দুটি দ্বীপ। কাচ সাঁকো ছিল। ভেঙে চৌচির।
যুদ্ধবিরতির সাদা অভ্যাসপতাকা উড়ছে। কাঁটাতার।
ক্যাকটাস বাগান। অর্কিড নিকুঞ্জে গাহে পাখি।
বোবা মেহেদি রাঙানো হাত ভিখিরির বাটি পেতে রাখে।
নিঃশব্দের রক্তে ভরে উঠছে।

২.
লতাকে তৃষ্ণার্ত রাখো। আরো বেশি ফুল দেবে।
নারীকেও। সে আরো লাবণ্য ছড়াবে।
অডিকোলনের গন্ধ তোমার শরীরে। গ্রীষ্মদিনে।

প্রকৃতি শেখালো এই স্যাডিজম।
তুমি তার হাতের পুতুল।

৩.
আগাথা ক্রিস্টির কাছে স্পিলবার্গ রাত
ফুটি-কি না-ফুটি কিছু রহস্যের তারা
চেয়েছিল
কাল ভোরে লাল ডাকবাক্স খোলা হলে
দুছত্রের চিঠি
কাঁপা রোদ তোমাকে ভাসাবে

৪.
কফিকাপে তোমার মুখপ্রতিমা। যেমন নদীতে ভোরসূর্য।
হা হা চৈত্র উত্তরপঞ্চাশে। বাতাসী প্রান্তরে।
বহুদূরে ক্লান্ত রিক্সা, সে কি জানে!
শূন্য থেকে শব্দ উঠে আসে। আবার শব্দেরা শূন্যে ফিরে যায়।
তার কোনো প্রতিচ্ছবি নেই।

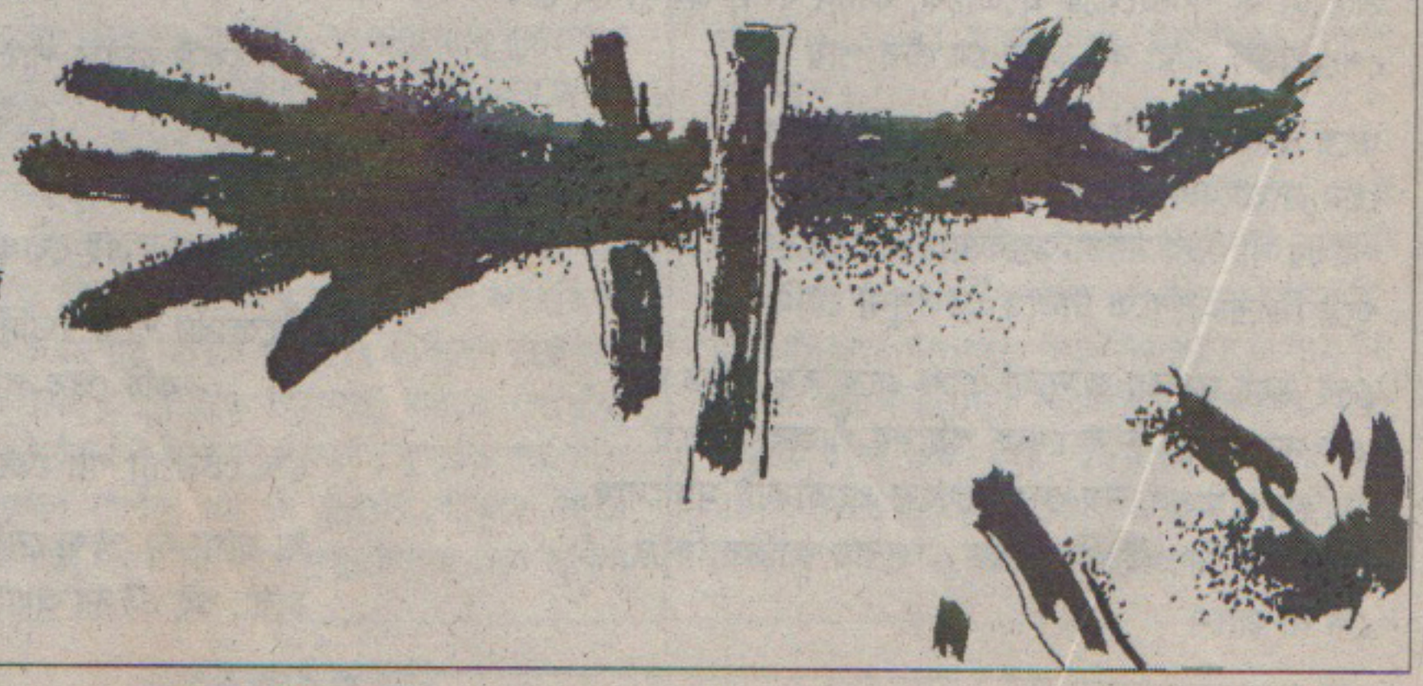

অনন্ত নক্ষত্রের রাজ্য

নেহাল আদেল

রক্ত পলাশ
উচ্ছল
সমুদ্র সঙ্কেত
এখনও উত্তাল।

দুরন্ত নদী
দুর্বার প্রাচীর
অন্ধকার
আবহমান সঙ্কেত।

গগনবিদারী
নভোচারী
তারকা-রাজ্যে
সন্ত্রাসিত প্রেতাত্মা।

অসঙ্কোচে
জাগছি আমি
বিশ্বের চিতাভস্মে
নগ্ন তাপস।

আমাকে ভাঙতে হবে দেয়াল
প্রবহমান নদীর মত
বয়ে যেতে হবে।

আমি ফিরবো,
ফিরবো তোমার জন্মদিনে,
সেটা কি এক চৈতালী দিন ছিল ?
বিপদ সঙ্কেত নেই।

তবুও কি মনে হয় না
বঙ্গোপসাগরে ঝড় ওঠে
ঝড় ওঠে বরগুনার কূলে
আর আমি পারা নদী বয়ে চলি।

তুমি কাঁদছো কেন ?
আকাশ তো জাগছে,
জাগছে তারকারা
অনন্ত নক্ষত্রের রাজ্য।

শাদা শামুক

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

বিশাল শাদা শামুক
শক্ত পিঠ দিয়ে আটকে রেখেছে
ওপারে যাবার দরজা।

ওখানে নক্ষত্রের আলোমাখা নীল বাগান
গভীর নির্জনতা আত্মবিস্মৃতির মত নিগম।
বক-ওড়া সন্ত দুপুরে সোনার ঘোড়ায় চড়ে আসে মেঘ
হীরেয়-গড়া শিশুর মত শীতের রোদ্দুর
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়ায়
ধ্যান শান্ত নৌকো বেয়ে যায় হেমন্ত।

তিল ফুলের মত ছোট্ট কাজল টিপের মত গোল
শান্ত আলো জ্বলে ওঠে।
লাল কিশমিশ ফুল ফোটে সে-আলোয়।
লিচু-খোসা-আকাশে খড়ির হিজিবিজি নকশা,
কখনো মিহিদানা-রঙে কখনো তাতে চা-কাঠের পালিশ।

সূর্যে কতো রঙের জঙ্গল—
শাদা শামুক শক্ত পিঠ দিয়ে আটকে রেখেছে
ওপারে যাবার দরজা।

জন্মান্তর

জরিনা আখতার

শতাব্দীর ভস্মে আচ্ছাদিত হয়ে আছে তোমার যে চোখ
আমি চাই তার উন্মীলন—
জেগে ওঠো,
খুব চড়ামূল্যে ক্রীত ফুলদানিতে সাজানো বারোয়ারি ফুলের মতো নয়
আমি চাই শুদ্ধ জাগরণ
একাকী অনন্য অকুতোভয়
যার নাম শুভ্র কাশফুল;
বিস্তীর্ণ সবুজ ভেদ করে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘ ঋজু
মাথা উঁচু করা সেই অপরূপ বিস্ময়—
তার মতো জেগে ওঠো।

যুগ যুগব্যাপী প্রগাঢ় নিদ্রায় অবলুপ্ত হয়ে আছে তোমার যে চৈতন্য
আমি চাই তার প্রত্যাবর্তন
সময় অতিক্রান্ত হবার আগেই ফিরে এসো—
যেমন অমানিশার অবগুণ্ঠন ভেদ করে উদিত হয় ভোরের সূর্য
কিংবা সন্ধ্যার অসীম আকাশে জেগে ওঠে মোহময় চাঁদ
দু-ই সত্য— সেই সত্যের সমভূমিতে এসে দাঁড়াও তুমি।
প্রকৃতির বিশাল প্রেক্ষাপটে ক্ষীপ্রগতি পাহাড়ি ঝর্নার রূপালি ধারা
কিংবা নিভৃত গ্রাম ছুঁয়ে বহমান শান্ত নদীর ক্ষীণ স্রোতধারা
দু-ই সুন্দর— সেই সহজ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হও তুমি।
ভোরের মালঞ্চে ঝাঁকবাঁধা পাখিদের কুহুতান
কিংবা অজস্র অবুজ শিশুর অবিরাম কলতান
দু-ই সুমধুর— সেই সরল মাধুর্যে ধ্বনিত হও তুমি।
তোমার মৃত্যু আছে জানি
কিন্তু জন্মও তো সত্য—
আমি চাই সেই সত্যের উদ্বোধন
চাই বার বার তোমার জন্মান্তর।

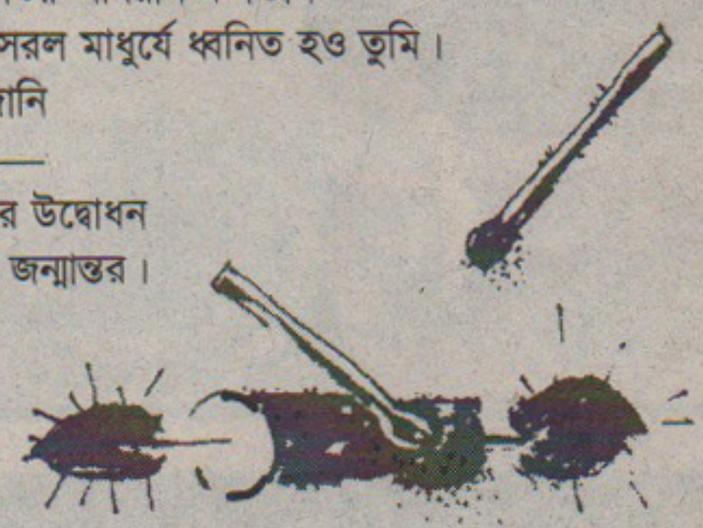

এক আগুনের ছাই

ফারুক মাহমুদ

একই কষ্টের দুই প্রান্তে আমরা দু'জন
রপ্ত করেছি সমন্বয়ের ভাষা
ঝড়ো-বৃষ্টি, মেঘ, ভোরের কুয়াশা
দুঃখ কুড়াই মন্দ-ভালোয় আমরা দু'জন

আটঘাট বাঁধা প্রস্তুতি ছিলো— যাইনি
শুরু থেকে শুরু করা যায়
প্রস্তুতি ছিলো সহযোগিতার— চাইনি
পথ আছে চেনা চলাচল শিখি নাই

আমরা দু'জন এক আগুনের ছাই।

পুনশ্চ নকটার্ন

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

যার আসার অপেক্ষায় আছি
এই মধ্যরাতের টেবিলে এখনো তার
পায়ের আওয়াজ পড়েনি
জানালায় তারারা সুস্থির রুদ্ধশ্বাস
এইমাত্র বাতাস
তার একতারা নামিয়ে রাখলেন।
পাতাদের কলবলানি কথা
এর ওর গায়ে ঢলে পড়া থেমে গেছে
শিশুদের ঘুম পেলে যেমন চোখের মণি
স্থির হয়ে আসে,
নক্ষত্ররা স্থির।
উর্ধ্বমুখী মাছের মত বাতাসের ডগা খাচ্ছে গাছ।

জানি না আজ রাত্রে আদৌ আসবেন কিনা।
কথা তো অনেকেই দেয়, শেষপর্যন্ত
আসি আসি করে শেষ ট্রেনটাও চলে যায়,
ইস্টিশান পড়ে থাকে মাস্টারের আইবুড়ো মেয়ে।
যার আসবার কথা
আগে তিনি ঘন ঘন আসতেন,
বসতেন ঘরের একমাত্র চেয়ারটায়,
গল্পগাছা হতো, তেলযোগে মুড়ি এবং
সবশেষে চা।
উঠে যাবার আগে ফেলে যেতেন
দু'একটা ছেঁড়া পাতা, এটা সেটা আঁকিবুকি, ছবি।
তার যাবার পর আকাশটা নীল হয়ে আসতো
ঘন হয়ে আসতো বিকেলের সুমন্দ বাতাস,
আর তিনি চলে গেলে বুক জুড়ে হু হু।

কে তিনি আমার ?
কেন মধ্যরাতে আসবেন কথা দিলেন ?
শ্মশ্রুময় সেই কালো যুবরাজ, হাতে বালা,
কর্ণকুন্তলে মালায় চন্দনে আঁকা প্রতিমূর্তি,
অ্যাভারনাসের থিক্‌থিকে কাদা পার হয়ে
পার হয়ে আগুনের নদী, সপাটে জড়িয়ে ধরে
মেডুসার বিসর্পিণী ঘাড়,
কেন তিনি আসবেন ? কী তার কাজ
এই মধ্যরাতে ঘুমহীন কবির ঘরে ? নিষ্প্রদীপ
চরাচর ভেঙে এইমাত্র শুরু হলো হুহুম্।'
হঠাৎ আকাশ ফেঁড়ে ছুটে গেলো তিন তিনটে তারার বল্লম,
বিদ্যুতের চাবুক খেয়ে কঁকিয়ে উঠলো উর্ধ্বমুখী গাছ
বনমধ্যে হুড়োহুড়ি, আর
এক ঝটকায় ভেঙে গেলে সকল দুয়ার
গৃহমধ্যে তিনি, আহা, কৃষ্ণ যুবরাজ
আহা এমন করে কি তাঁরে বাঁধে!
আমার ক্ষুদ্র ঘরের চাল ফুঁড়ে উঠে গেল তাঁর মাথা
তাঁর পা আঁকড়ে ধরেছে মাটি, জটা থেকে
ঝরে পড়ছে আলো!
আমি তাকে কী বলব, কী বলব শুধু ভাঙা চেয়ারটার
দিকে দেখালাম, বললাম এই নাও পদ্মাসন, এই নাও
তিন দশকের নড়বড়ে স্থাপত্য আমার, যদি চাও নিয়ে যাও
তারার উপান্ত ছেড়ে অয়নান্ত পার হ'য়ে তোমার মুলুকে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলি থেকে উত্তর আসে,
নয় নয়, হয়নি সময়।
কুয়াশা সরে গেলে চেয়ে দেখি
চেয়ার হাতলে তার উত্তরীয় দোলে।

ইচ্ছে

প্রত্যয় জসীম

ইচ্ছে করে ...
তোমার চোখের সরোবরে
ডুব দিই সাঁতার কাটি॥

ইচ্ছে করে...
তোমার চুলের স্বপ্নডোরে
ঘুম দিই বিছিয়ে পাটি॥

ইচ্ছে করে...
তোমার বুকের নরম চরে
ফসল বুনি ফসল কাটি॥

ইচ্ছে করে...
তোমার কোমল দুহাত ধরে
চন্দ্রালোকে শুধুই হাঁটি॥

নারী

আসাফ আবদুল্লাহ

১.
দূরত্বে আছো
বিস্ময়ে আছো
বেশ আছো
আছো নিঃসংশয়।

২.
অভিমানী নারী চলে গিয়েছে বহুদূর
বলেছে, এই শেষ, আর হবে না দেখা।
জানি 'একবার চলে গেলে নারী ফেরে না আর।'
তবে কিছুক্ষণের মধ্যে; আসবে একবার নিশ্চয়
সোনার বালাটা ভুলে ফেলে গিয়েছে টেবিলের ওপর।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রাসঙ্গিকতা

আবু রুশ্‌দ্‌

সম্প্রতি অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্যারিসে হঠাৎ মারা যাবার পরে তাঁর স্বামী সম্বন্ধে আমাদের দেশের লেখক ও সংস্কৃতি সেন্টর কৌতূহল ও আগ্রহ নতুন করে জেগেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (তাঁর নামের সঙ্গে 'সৈয়দ'টা নিখুঁতভাবে একাত্ম হয়ে গেছে) প্রসঙ্গে আসবার আগে তাঁর স্ত্রী অ্যান-মারি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। এখানে কিছুটা ব্যক্তিগত কথা বলে নিই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ইউনেস্কোর প্যারিস সদর দপ্তরে পাকিস্তান সরকারের মনোনয়ন পেয়ে যখন এক দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন সেই সময়েই ফরাসী তরুণী অ্যান-মারির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ নিজে ফর্সা রঙের বেশ সুদর্শন যুবক ছিলেন। এবং অ্যান-মারিও সেই সময়ে খুবই সুশ্রী ও মনোলোভা এক তরুণী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলাপ অচিরেই ঘনীভূত হয়ে আকর্ষণ-সখ্য ও শেষে প্রেমে পরিণত হয়। এবং তাঁরা দুজনেই সুখী ও সমৃদ্ধ এক সংসারের স্বপ্ন দেখে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

তবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনে অ্যান-মারির আসল তাৎপর্য হলো এই ফরাসী রমণী তাঁর স্বামীর বাংলায় সাহিত্য রচনার সঙ্গে বরাবরই গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ফরাসী ভাষায় 'লালসালু' অনুবাদ করে তিনি সে উপন্যাস প্রকাশের জন্য একটা ভাল ফরাসী প্রকাশককে সম্মত করাতে পেরেছিলেন। পরে 'লালসালু' ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়ে 'A tree without root' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক কে ছিলেন এখন ঠিক মনে নেই। Chatto & Windus হতে পারে। তবে বইটির প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছিল ইউনেস্কো। মারা যাওয়ার আগে অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' ফরাসী ভাষায় অনুবাদ শেষ করে যেতে পেরেছেন। ইংরেজিতে বইটির নাম Black Moon. Moon-এর আগে Black বিশেষণের প্রয়োগ স্বকীয়তার স্বাক্ষর বহন করে। অ্যান-মারি যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস ফরাসী পাঠকমহলে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন তা বাঙলা সাহিত্যে আগ্রহী প্রত্যেক লোকেরই প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে।

খবরে প্রকাশ, ওয়ালীউল্লাহ্‌ ও অ্যান-মারির দুই সন্তান ও একাধিক নাতি আছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রায় সমকালীন এক লেখক হিসেবে আমি প্রার্থনা করি তারা সকলে যেন সুখী ও স্বস্তিপূর্ণ জীবনের সন্ধান পায়।

> রুচিবান ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব হয়েও ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাসে গ্রামবাঙলার জনমানসেরই ছবি বরাবর ফুটে উঠেছে। সেখানে তাঁর শাণিত ব্যক্তিত্ব ও প্রখর নাগরিকতার কোন ছাপ পড়েনি। এই বৈপরীত্যের আসল কারণ বোধহয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র শৈশব ও কৈশোর মোটামুটি গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যেই কেটেছে এবং এর খুঁটিনাটি তাঁর পর্যবেক্ষণের আওতার মধ্যেই ছিল। তাই পরিবেশগতভাবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের কোনটাই পরিচয়হীনতার খপ্পরে পড়েনি।

দুই.

এখন কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করবো। অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার তেমন স্থায়ী ও সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। যা পেরেছিল আমাদের আর দুজন খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিকের ক্ষেত্রে : তাঁরা হলেন শওকত ওসমান ও রশীদ করীম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় দেশবিভাগের আগে থেকেই। তিনি তখন 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থ লিখে সুধী ও বিদগ্ধ পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমারও তখন গল্পলেখক হিসেবে মুসলমান সমাজে বেশ কিছুটা পরিচিতি হয়ে গেছে। সেই বয়সে ওয়ালীউল্লাহ্‌ যেমন সুদর্শন এবং শাণিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আমার মধ্যেও সেই লক্ষণগুলির কিছু ছিটেফোঁটা ছিল। তাই প্রায়শই আমাদের

মধ্যে যোগাযোগে দুই উঠতি গল্পলেখকের ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও দেখা যেতো।

দেশবিভাগের পর ঢাকায় এসে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার দু'তিনবার দেখা হয়েছিল। প্রথমবার তাঁকে দেখেছিলাম পুরনো পল্টনের এক দোতলা বাসায়, যার নিচতলায় তিনি থাকতেন। তখন ওয়ালীউল্লাহ্‌ সম্ভবত রেডিও পাকিস্তানে নিউজ এডিটরের কাজ করতেন। একদিন শুনলাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র পুরনো পল্টনের বাসায় কলকাতা থেকে গোলাম কুদ্দুস হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন। গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি আমার প্রথম উপন্যাস 'এলোমেলো' সম্বন্ধে বেশ প্রশংসাসূচক উক্তি করে খুব সম্ভবত তখনকার 'মিল্লাত' পত্রিকার ঈদসংখ্যায় একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য নিবন্ধ লিখেছিলেন। তবে পুরনো পল্টনে গিয়ে এই দুই সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে আমি অনেকটা বিনাদোষেই কিছুটা কোনঠাসা হয়ে পড়ি। তাই তাঁদের অস্বস্তি প্রলম্বিত না করে আমি আন্তরিক সৌজন্যের সঙ্গে বিদায় নিই। পরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে আমার সামনেই আমার দুটো গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করতে শুনেছিলাম। কোন এক সাহিত্যসভায় পড়া আমার 'হাড়' গল্প সম্বন্ধে তিনি বেশ প্রশংসাসূচক কথাই বলেছিলেন। তবে মাসিক সওগাতে প্রকাশিত 'লাজুক' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, গল্পটিতে নায়কের চরিত্রে কোন বিকাশ ঘটেনি, শুধু তার লাজুক প্রকৃতিটাই বার বার প্রতিফলিত হয়েছে।

চল্লিশ দশকের শেষের দিকে ওয়ালীউল্লাহ্‌ করাচির নামকরা ইংরেজি দৈনিক 'ডন'-এ তখনকার মুসলিম লেখকদের সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে আমার সম্বন্ধে একটা মন্তব্য ছিল : 'আবু রুশ্‌দ্‌-এর অভিজ্ঞতা বেশি হলে তিনি পরে বিশিষ্ট লেখক হতে পারবেন।' এই কয়টা বিচ্ছিন্ন ব্যাপারের বাইরে আমার লেখা সম্বন্ধে বিশদ মন্তব্য করতে ওয়ালীউল্লাহ্‌ কখনও প্ররোচিত হননি। অবশ্য একসময় আমার ছোট ভাই রশীদ করীম যখন কর্মোপলক্ষে প্যারিস গিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন কথাচ্ছলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ বলেছিলেন যে, আবু রুশ্‌দ্‌ও আমাদের একজন উল্লেখযোগ্য লেখক। অবশ্য আবু রুশ্‌দ্‌-এর তরফ থেকে ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ্‌ মূল্যায়ন 'শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস' বইটির এক তৃতীয়াংশের বেশি জায়গা জুড়ে আছে।

তিন.

এটা লক্ষ্যযোগ্য রুচিবান ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব হয়েও ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাসে গ্রামবাঙলার জনমানসেরই ছবি বরাবর ফুটে উঠেছে। সেখানে তাঁর শাণিত ব্যক্তিত্ব ও প্রখর নাগরিকতার কোন ছাপ পড়েনি। এই বৈপরীত্যের আসল কারণ বোধহয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র শৈশব ও কৈশোর মোটামুটি গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যেই কেটেছে এবং এর খুঁটিনাটি তাঁর পর্যবেক্ষণের আওতার মধ্যেই ছিল। তাই পরিবেশগতভাবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের কোনটাই পরিচয়হীনতার খপ্পরে পড়েনি।

এখন ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাসের খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক। প্রথমে বলা দরকার যে, আমি ঔপন্যাসিক হিসেবে শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পর্যালোচনা উপরোক্ত বইয়ে কিছুটা বিস্তৃতভাবে করেছি। তাই সেখান থেকে যথাস্থানে কয়েকটা উদ্ধৃতি দেওয়া ছাড়া আমি তার পুনরাবৃত্তি করবো না।

এখনও আমার মনে হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাসের মধ্যে শৈল্পিকভাবে সফলতম হলো 'লালসালু'। এই কারণে বলছি যে, 'লালসালু'র কাহিনী, চরিত্রায়ন, পরিবেশ বা আবহতে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব তেমন প্রকটভাবে দেখা যায়নি। বিখ্যাত ইংরেজ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনপঞ্জী

১৯২২ ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : সৈয়দ আহমদউল্লাহ্‌। মাতা : নাসিম আরা খাতুন ওরফে নাসিমা। মৃত্যুকালে পিতা ছিলেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। তাঁর মাতা ছিলেন চট্টগ্রামের অন্যতম অভিজাত পরিবারের মেয়ে।

১৯৩০ নাসিম আরা খাতুন পরোলোকগমন করেন।

১৯৩৯ কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন।

১৯৪১ প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করেন।

১৯৪৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিসটিংশনসহ বি. এ. পাশ করেন।

১৯৪৫ ২৬ জুন পিতৃবিয়োগ। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম. এ. পড়েন। 'দ্য স্টেট্‌সম্যান'-এ সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। 'কন্টেম্পোরারী' নামে একটি ত্রৈমাসিক বের করেন। 'কমরেড পাবলিশার্স' নামে একটি প্রকাশনা-সংস্থাও খোলেন এবং ডবল্যু. এইচ. হান্টারের 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস' পুনর্মুদ্রিত করেন। পূর্বাশা লিমিটেড কলকাতা থেকে বেরোয় তাঁর 'নয়নচারা' –প্রথম গ্রন্থ।

১৯৪৭ 'দ্য স্টেট্‌সম্যান'-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৪৯ প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' কমরেড পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বার্তা সম্পাদক রূপে করাচীতে রেডিও পাকিস্তানে যোগদান করেন।

১৯৫১ ৫ মে নয়াদিল্লীতে পাক দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারীর মযাদায় প্রেস এটাশী হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৫২ অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে ২৭ অক্টোবর প্রেস এটাশি হয়ে বদলী হন।

১৯৫৪ ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত সিডনীতে প্রেস এটাশি ছিলেন; ১৪ অক্টোবর থেকে তথ্য অফিসার হিসেবে ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য অফিসে বদলী হন। দেড় বছর এ চাকরি করেন।

১৯৫৫ 'বহিপীর' লেখেন এবং PEN এর একটি আঞ্চলিক পুরস্কার পান। ৩ অক্টোবর বিয়ে হয় করাচীতে। তাঁর ফরাশিনী স্ত্রীর নাম অ্যান-মারি লুই রোজিতা মার্সেল থিবো। বিয়ের আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নাম রাখেন আজিজা মোসাম্মৎ নাসরিন। তাঁদের বিয়ের দেনমোহর পাঁচ হাজার টাকা।

১৯৫৬ জাকার্তায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক রূপে ২৮ জানুআরি বদলী হন। দেড় বছর এ পদে ছিলেন।

১৯৫৭ তথ্য পরিচালকের পদটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় জাকার্তায় পাক দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারির মর্যাদায় প্রেস এটাশি হন।

১৯৫৮ ডিসেম্বরে জাকার্তা থেকে করাচী বদলী হন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে অফিসার অন্‌ স্পেশাল ডিউটি রূপে। তখন দেশে সামরিক আইন।

১৯৫৯ ১৬ মে থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে লন্ডনে প্রেস এটাশী। ১৯ অক্টোবর জার্মানীর বন্‌-এ প্রেস এটাশি রূপে যোগদান করেন।

১৯৬০ ফেব্রুআরিতে প্রথম সেক্রেটারি রূপে পদোন্নতি হয়।

১৯৬১ ১ এপ্রিল প্যারিসে একই পদে বদলী হন। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে 'বাঙলা একাডেমী পুরস্কার' পান। 'লালসালু' ফরাশি অনুবাদ প্যারিস থেকে বেরোয়।

১৯৬৪ 'চাঁদের অমাবস্যা', 'সুড়ঙ্গ' এবং 'তরঙ্গ-ভঙ্গ' প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫ 'দুই তীর' প্রকাশিত হয় এবং এটির জন্য 'আদমজী পুরস্কার' পান।

১৯৬৭ ৮ আগস্ট, পি-৫ গ্রেডে প্যারিসেই ইউনেস্কোতে প্রোগ্রাম স্পেশ্যালিস্ট রূপে যোগদান করেন। বেতন বছরে ১৫,২৮১ মার্কিন ডলার। 'লালসালু'র ইংরেজি রূপান্তর Tree Without Roots ইউনেস্কোর সহযোগিতায় লন্ডনের প্রকাশন Chattu & Windus থেকে বেরোয়।

১৯৬৮ 'কাঁদো নদী কাঁদো' প্রকাশিত হয়।

১৯৬৯ ১৮ ডিসেম্বর এক যুগ পরে সপরিবারে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। সাহিত্যমহলে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। এক মাস ছিলেন দেশে।

১৯৭০ পুনরায় কয়েকদিনের জন্য দেশে আসেন, একা। ৩১ ডিসেম্বর ইউনেস্কো থেকে চাকরিচ্যুত হন।

১৯৭১ ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্যারিসে বসে স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে থাকেন। তখন তিনি বেকার।

১০ অক্টোবর গভীর রাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

□ সৈয়দ আবুল মকসুদ

সমালোচক লর্ড ডেভিড সেসিল তাঁর 'ভিক্টোরিয়ান নভেলিস্টস' গ্রন্থে উপন্যাসের আলোচনায় প্রথমেই বলেছেন : 'সফল উপন্যাসের প্রথম, যদিও মহত্তম নয়, শর্ত হলো তার বিশ্বাসযোগ্যতা'।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরের দুই উপন্যাস থেকে যে কারণে 'লালসালু' আলাদা তা হলো কাহিনীর সরলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা— উপন্যাস প্রসঙ্গে যে বিশ্বাসযোগ্যতার কথা লর্ড সেসিল বলেছেন। তাছাড়াও পরিচিত পরিবেশের নিপুণ শৈল্পিক নির্মাণে, সফলতর চরিত্রায়নে, মুসলিম জনমানসের সুপর্যবেক্ষিত ও কুশলী উন্মোচনে। 'লালসালু'র কাহিনী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আমার পূর্বোল্লেখিত বইয়ের ভাষাতেই বলি : 'প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা কাহিনীকে অবান্তর মনে হয়, কিন্তু মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশের পর থেকে কাহিনী বেশ গতিময় হয়ে ওঠে..... মহব্বতনগরে প্রবেশ করবার কিছুদিনের মধ্যেই মজিদ ('লালসালু'র নায়ক) বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগ যুগের হাওয়ায় কালচে ভাঙা এক প্রাচীন কবরকে মোদাচ্ছের পীরের বলে ঘোষণা দেন। শীর্ণ, কিছুটা বেঁটে, ঠাণ্ডা, ভীতু মজিদ নকল মাজারকে লালসালু পরিয়ে নিজের রুজি ও প্রতিপত্তির প্রধান অস্ত্র হিসেবে পটু কাপট্যে ব্যবহার করে অচিরেই মহব্বতনগরের সবচেয়ে মানী ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে খাড়া করে তুললো'।

এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। মজিদ শুধু ভণ্ড প্রতারকই নয়, তার মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতিও বোধ হয় উত্তরাধিকার সূত্রেই কিছুটা রয়ে গেছে। বর্তমানে ধর্মকে দুমড়ে-মুচড়ে রুজির প্রকৃষ্টতম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করলেও সে গারো অঞ্চলের কাছে এক দুর্গম অঞ্চলে তার মোয়াজ্জিন হিসেবে কাজ করার কথা একেবারে ভুলতে পারেনি। নিজের স্বরে মিহি কণ্ঠে আজানের শব্দ শুনে সে এক সময় নিজের মধ্যে এক অনির্ধারিত কিন্তু প্রবল আধ্যাত্মিক অনুভূতির সম্মুখীন হতো। এখনও তার প্রথম নিঃসন্তান স্ত্রী রহিমাকে সে খাঁটি স্নেহের চোখে দেখে এবং তার দ্বিতীয় কিশোরী স্ত্রী (অবশ্য প্রথম স্ত্রীর সম্মতিসহ) জমিলার কিশোরসুলভ বিদ্রোহকে উপভোগ করতে অভ্যস্ত হয়। তাই মজিদকে শেষ পর্যন্ত এক জটিল ও সূক্ষ্ম অনুভূতির বলিষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হয়। 'নিজের কপট সংকল্পকে নিপুণভাবে লুকিয়ে রেখে সে যখন পার্থিব সাফল্যের পথে তরতরিয়ে এগিয়ে যায় তখন নিজের অজান্তেই বোধ হয় তার মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ও এসে পড়ে। তার আস্থা বাড়ে, ভীতু মানুষটির আসল চেহারাটা শেষ পর্যন্ত সফলভাবে ঢাকা থাকে। সে বুঝতে পারে যে তার এই বিশেষ পেশাটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং যদি কোনদিন তার ছদ্মবেশ খসে পড়ে, তাকে সকলের কাছে বিকৃত করে তোলে তাহলে মনে মনে সে তৈরি থাকে

ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সম্পত্তি ও অনুচরদের ছেড়ে সে নতুন এক দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাবে। এই কঠিন সংকল্পই তার সমস্ত কর্মকাণ্ডকে এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। এই মূল চরিত্র ছাড়াও মজিদের দুই স্ত্রী রহিমা ও জমিলা দক্ষ চরিত্রায়নের আর দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিশোরী জমিলার বিদ্রোহী মনোভাব ও প্রকৃতির কথা আগে কিছুটা বলা হয়েছে। এখন রহিমার কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া দরকার। পুরন্ত স্বাস্থ্যের এই পরিশ্রমী মহিলা সংসারের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে নিয়ে সব কাজই নীরবে সম্পন্ন করতে অভ্যস্ত। জীবন সম্বন্ধে তার প্রত্যাশা খুব বিস্তৃত ও গভীর নয়, শুধু স্বামীর সস্নেহ মনোযোগ পেলেই সে বর্তে যায়। যখন সে নিঃসন্তান বলে স্বামী আর একটা বিয়ে করার অনুমতি তার কাছ থেকে চায় তখন সে তাদের গৃহস্থালীর অন্তর্গত এক বালিকাকে পালিতা কন্যা হিসেবে নেওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে। স্বামী তাতে নিরস্ত না হয়ে উল্লেখ করে তাকে দেখবার জন্য একটা সমর্থ মেয়েকে ঘরে আনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

রহিমা তখন স্বামীর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার কথায় কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে হলেও সম্মতি দেয়। বস্তুতই রহিমা এক স্মরণীয় চরিত্র।

'লালসালু'র এক লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পরিবেশকে সূক্ষ্ম রেখার প্রয়োগে বাস্তব ও জীবন্ত করে তোলা। 'বাংলাদেশের হাওয়া, আলো, মাটি, ঝড়, বৃষ্টি কাহিনীতে লেপ্টে-সেপ্টে আছে এবং সেখানে বিদেশী কোন আবহের কারবারই নেই।' এ কথাটা ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাকি দুই উপন্যাস সম্বন্ধে বলা যায় না।

এর একটা দৃষ্টান্ত :

'থাবলা-থাবলা রুঠা জমি। ডোবা জমি কাদা জমি– ফাটল ধরা জৈষ্ঠ্যের জমি সব জমি একান্ত আপন।'

কোনরকম মাধ্যমিক প্রস্তুতি ছাড়াই 'লাল সালু'র বাস্তব পরিবেশ থেকে 'চাঁদের অমাবস্যা'র প্রতীকী জগতে প্রবেশ পাঠকের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। অবশ্য 'লালসালু'র মতো 'চাঁদের অমাবস্যা'র কাহিনীও তেমন জটিল নয়। এক যুবতীর ভয়াবহ ধর্ষণ ও বীভৎস হত্যাকাণ্ড নিয়ে এক যুবক শিক্ষকের মনে কী প্রতিক্রিয়া সেটাই এ উপন্যাসের মূল কাহিনী। আজকাল খবরের কাগজ খুললেই এরকম ৫-৬টা ঘটনার কথা প্রায় রোজই জানা যায় কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌ যখন এই উপন্যাসটি লেখেন তখন এ ধরনের ঘটনা বোধ হয় সচরাচর ছিল না। এক রাতে বাঁশের ঝাড়ে প্রায় নগ্ন এক যুবতীর লাশ দেখে এবং বাঁশঝাড়ের বাইরে তার আশ্রয়দাতা পরিবারের ছোটসাহেবকে দেখে হত্যাকারী কে সেই সম্বন্ধে যুবক শিক্ষকের মনে একটা শিক্ষিত অনুমান দেখা যায় কিন্তু প্রথম দিকে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সে ইতস্তত করে। যুবক শিক্ষক হত্যাকাণ্ড থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখবার চেষ্টা করে এই মনে করে যে বাঁশঝাড়ের কথাটি তার নিজের আর সম্ভাব্য হত্যাকারী ছোটসাহেবের মনের গোপন কথা। 'শরীরের গোপন স্থানে গুপ্ত ক্ষতের মতো। এমন কথা কাউকে বলা যায় না।'

—এই তুমুল অভিজ্ঞতার নিষ্পেষণে যুবক শিক্ষকের মনে যে দ্বন্দ্ব ও সংকল্পহীনতা দেখা যায় তা নিয়েই কাহিনীর সম্প্রসারণ। শেষে যুবক শিক্ষকটি সিদ্ধান্ত নেয় কথাটা প্রকাশ না করে তার মুক্তি নেই। 'বাঁশঝাড়ে একটি নারী অর্থহীনভাবে জীবন দিয়েছে। তার বিশ্বাস মানুষের জীবন এত মূল্যহীন নয়। না সত্যিই তার উপায় নেই।' তাই সে ঠিক করে দারোগাকে এই হত্যাকাণ্ডের কথা তাকে জানাতেই হবে। তাকে অবশ্য ফুসলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, ঘটনাটা গোপন করলে তার চাকরি বহাল থাকবে আর সে তার বুড়ি মা ও ভাইদের ভরণ-পোষণের জন্য নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারবে। শেষ পর্যন্ত যুবক শিক্ষক এই প্রলোভনের উপরে উঠতে পেরেছিল।

শেলী

আধুনিক পাঠকের নান্দনিক পত্রিকা

বর্ষ ৩ সংখ্যা ১২ □ ১ আগস্ট ১৯৯৭ □ ১৭ শ্রাবণ ১৪০৪

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

চিঠিপত্র ৪

পুনশ্চ

ঔপন্যাসিকের বিবেক : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ □ শিবনারায়ণ রায় ৭

কবিতা

শওকত আলী, মোহাম্মদ রফিক, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, নেহাল আদেল, দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়,
জরিনা আখতার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ফারুক মাহমুদ,
প্রত্যয় জসীম, আসাফ আবদুল্লাহ ১৩

প্রচ্ছদ রচনা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রাসঙ্গিকতা □ আবু রুশ্‌দ্ ১৮

কিছু স্মৃতি : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ □ আবুল হোসেন ২৩

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, তাঁর উত্তর-সাধনা □ বশীর আল্‌হেলাল ২৯

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আন্দালুসিয়া ভ্রমণ ও অস্তিত্ববাদী হিস্পানী
ঔপন্যাসিক উনামুনো □ সৈয়দ আবুল মকসুদ ৩৫

মুক্তিযুদ্ধ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর নাটক □ শান্তনু কায়সার ৪০

গল্প

দুধ □ মশিউল আলম ৪৫

অলিখিত স্বপ্নের আখ্যান □ প্রশান্ত মৃধা ৫৩

শ্যামল মেঘের ছলনা □ পাপড়ি রহমান ৬১

নিবন্ধ

হিরোশিমা : ভালোবাসা আমার □ এম. এ. সবুর ৪৯

ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ি এবং সায়গল □ সাঈদ আহমদ ৫৬

বিজ্ঞান

বুড়িয়ে যাওয়া আর নয় □ তৌহিদুর রহমান ৫৯

শব্দশিল্প

দুই বাংলার থিয়েটার □ নৃপেন্দ্র সাহা ৬৩

প্রচ্ছদচিত্র : হাশেম খান

প্রধান সম্পাদক
ইকবাল আহমেদ

সম্পাদক
কায়সুল হক

বেক্সিমকো মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
ইকবাল আহমেদ কর্তৃক
১৬১ মতিঝিল বা/এ ঢাকা ১০০০
থেকে প্রকাশিত এবং
নন্দিনী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৫৫/বি ইনার সার্কুলার রোড
ঢাকা ১২১৭ থেকে মুদ্রিত

দাম ১৫ টাকা

রহমান ম্যানশন ৪র্থ তলা, ১৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৪৬৩৫, ৯৫৬৪৬৩৮, ৯৫৬৪৬৩৯, ৯৫৬৮৬০৩
ফ্যাক্স : ৯৫৬৪৬৩৭, E-mail : bexml@enigma.kaifnet.com

কাহিনীতে যে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের ভাব, তার সঙ্গে লেখক যে আবহাওয়া তৈরি করেছেন তা বেশ খাপ খেয়ে গেছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক

: 'যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগীর মুখে হালকা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মহামারী হাহাকার দেখেছে, কিন্তু কখনও বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই।'

তবে এই উপন্যাসটিতে আসল শৈল্পিক বিপত্তি অন্যত্র। ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে যুবক শিক্ষকের মনে যে উথালপাতাল অনুভূতি হয় ও নানারকম চিন্তা ও ভাবনা তার মনে প্রবেশাধিকার চায়, –সেসবের দার্শনিক জটিলতা ও গূঢ়তা যুবক শিক্ষকের পটভূমি ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। এখানেই বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে। যুবক শিক্ষকের পড়ালেখার পরিধি বিস্তৃত বলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এবং তার মানসিকতা প্রাইমারি স্কুলের সাধারণ শিক্ষকের চেয়ে তেমন আলাদা কিছু সে হিসাবেও তাকে উত্থাপিত করা হয়নি। তাই পাঠকের মনে হয় যে, এখানে বানোয়াটি কৌশল কাজ করছে এবং লেখক নিজে তার মানসিকতায় ঢুকে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য যেকোন উপন্যাসে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য বজায় রাখার জন্য লেখকের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে, কিন্তু সেটা উঁচু দরের শৈল্পিক কুশলতার সঙ্গে করতে হয়। এই উপন্যাসে সে পরিচয় তেমন নেই। এই অসুবিধা এমনকি রবীন্দ্রনাথের গল্পেও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

তিনি তাঁর অনুপম ভাষায় তাঁর চরিত্রের শৈল্পিক অক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে নিজের বাচন কৌশল তার উপর প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে স্বাধীনতা নেন তা যদি আমাদের মতো লেখকরাও নিতে প্ররোচিত হন তবে উপন্যাসের বা গল্পের বা নাটকের কাঠামোতে বিশ্বাসযোগ্যতা ভয়ানকভাবে বিপন্ন হয়। 'চাঁদের অমাবস্যা'তে লেখক এই ঝুঁকি একাধিকবার নিয়েছেন, সে কারণে তাঁর সতর্ক ও সন্দিগ্ধ পাঠককে তিনি নিজের কাঁধে বহন করতে দুর্ভাগ্যবশত সক্ষম হননি। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে চাঁদের অমাবস্যা'র কাহিনীতে এক ধরনের ঘোরের সঞ্চার হয় যা আমাদের সাম্প্রতিক রচনায় বিরল।

এখন ওয়ালীউল্লাহ্‌র শেষ উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' প্রসঙ্গে আসা যাক। 'চাঁদের অমাবস্যা'র মতো 'কাঁদো নদী কাঁদো'র আখ্যানভাগও তাৎপর্যময় পর্যায়ে পুরো বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। নদী কাঁদার মতো কোন অপ্রাকৃত ঘটনাকে প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে হলে মানব-অস্তিত্বের যে চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের ছবি দেখানো একান্ত প্রয়োজনীয় তা এই উপন্যাসে ঘটেনি। 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাস লেখার সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবাস জীবন-যাপন করছিলেন। বিশেষ করে তিনি যখন ফ্রান্সে ছিলেন তখন তাঁর জীবনে এক সুখপ্রদ ঘটনা (অ্যান-মারির সঙ্গে তাঁর পরিচয়) তাঁর মন থেকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষণ্নতা ও শোক অনেকটা মুছে দেয়। তাই তিনি বিচ্ছিন্নতা ও শোককেই উপজীব্য করে উপন্যাস লিখতে বোধহয় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। এই সময় বাংলাদেশের নিসর্গকে তিনি অনেকটা কল্পনার চোখে দেখেছিলেন এবং চরিত্রায়নে ও মনস্তত্ত্বে কাফ্‌কা ও কাম্যুর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে 'কাঁদো নদী কাঁদো'র খণ্ড খণ্ড চরিত্রায়ন ও তাদেরকে পারম্পর্যযুক্ত করার জন্যে তিনটি বিভিন্ন কাহিনীকারকে উপন্যাসে উত্থাপন— তা

মৌলভীদের ফতোয়াবাজি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কী অভিশাপ বয়ে আনতে পারে, ধর্ষণের পাশবিকতা কতটা বীভৎস হতে পারে, কোন স্থির অবলম্বন ও প্রত্যয়ের অভাবে সামাজিক কাঠামো কীভাবে ভেঙে পড়তে পারে এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় হয় তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরে শৈল্পিক চাতুর্য ও কিছুটা মমতার সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে।

উপন্যাসের কাঠামোতে এই দুজন কুশলী লেখকের উপস্থিতিকে টেনে এনেছে। কাফ্‌কার 'The Castle' নাটকে দেখা যায় পর্বতের উপরে যেসব লোকের অবস্থান, তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উপত্যকার অধিবাসীরা যেমন অবহিত নয় তেমনি শেষোক্ত লোকেরা কী করছে সেটাও পর্বতে থাকা অধিবাসীদের কাছে রহস্যাবৃতই থেকে যায়। যেমন বিচ্ছিন্ন কুমারডাঙ্গার লোকেরা নদীর ওপারে যারা থাকে তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না বা দেশের বাকি অংশের অধিবাসীরা কুমারডাঙ্গার লোকদের সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যায়। এটা বিশেষ করে ঘটেছে কুমারডাঙ্গার স্টীমার চলাচল হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। তাই যে বিচ্ছিন্নতা ও শোকের কথা আমি আগেই বলেছি সেটা এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তারই দুঃখে বোধ হয় নদীকে কোন অন্তর্বেদনায় কুমারডাঙ্গার অধিবাসীরা কাঁদতে শুনেছে। যে ভয়ানক বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল প্লেগ-আক্রান্ত অধিবাসীদের সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার সব সংযোগ আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়ার কারণে। তাই দেখা যায় 'কাঁদো নদী কাঁদো' কাহিনীতে কাফ্‌কা ও কাম্যুর প্রভাব কাজ করছে।

এই আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও 'কাঁদো নদী কাঁদো'র বর্ণনায় ও চরিত্রায়নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ স্বাধীনভাবে শৈল্পিক সাফল্য অর্জন করেছেন। বিশেষ করে মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় মেয়ে হলে তার কাঁধ হাত পা ও আভাসের মতো বক্ষ আর পুরুষ হলে তার কেশ নখ গোঁফ লুঙ্গি পাঞ্জাবি ইত্যাদি লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে ও বর্ণনাকৌশলে জীবন্ত ও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। চলন্ত স্টীমারে ঝুলন্ত পর্দার ফাঁকে ফাঁকে যখন বাইরের হাওয়া ঢুকে পড়ে তখন স্টীমারের অভ্যন্তরে কীসব ওলট-পালট কাণ্ড হয় তার বর্ণনায়ও লেখক খুবই কুশলী। এবং 'চাঁদের অমাবস্যা'র মতো সার্বিক ঘোরের মধ্য দিয়ে দু'একটা চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসে। যেমন খোদেজা ও সখিনা। খোদেজা ও সখিনাকে কোন বিদেশিনী বলে ভুল করার উপায় নেই। কারণ তারা মুসলিম গার্হস্থ্য জীবনের অভ্যন্তরীণ তাৎপর্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সখিনা 'লালসালু'র রহিমার মতো সংসারের সব কাজ নিঃশব্দ-নৈপুণ্যে সমাধা করে, ছড়া আবৃত্তি করে, নিজের অত্যাবশ্যকীয় বইগুলো পড়ে এবং ছাতা-মাথায় স্কুলে যাবার সময় বিভিন্ন বয়সের ও শ্রেণীর পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। যেমন খোদেজার আত্মহত্যার অবশ্যম্ভাবিতা মুসলিম পরিবারের আবহের মধ্যেই করুণভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলতে হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রাসঙ্গিকতা এখনও অটুট রয়ে গেছে। মৌলভীদের ফতোয়াবাজি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কী অভিশাপ বয়ে আনতে পারে, ধর্ষণের পাশবিকতা কতটা বীভৎস হতে পারে, কোন স্থির অবলম্বন ও প্রত্যয়ের অভাবে সামাজিক কাঠামো কীভাবে ভেঙে পড়তে পারে এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় হয় তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তিনটি উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরে শৈল্পিক চাতুর্য ও কিছুটা মমতার সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দেশপ্রেম ও জীবিকা অর্জনের তাড়ার মধ্যে পড়ে অবিরত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে তিনি যদি আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা না যেতেন, তবে তাঁর নিঃসন্দেহ মেধা ও মনন নিয়ে তিনি আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে আরও কয়েকটা মূল্যবান সংযোজন করে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি যা দিয়ে গেছেন তারই যথার্থ মূল্য কে দেবে বা দেয়।

সব শেষে একটা কথা ঔপন্যাসিক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রভাব প্রবৃতি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর 'খোয়াবনামা'য় ও নাসরীন জাহানের বিভিন্ন রচনায় লক্ষ্য করা যায়– যা নতুন করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার প্রবহমনতা প্রমাণ করে।

কিছু স্মৃতি : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

আবুল হোসেন

প্যারিসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র হঠাৎ মৃত্যু আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলে মৃত্যুর প্রথম ছোবল। প্রায় তেইশ বছর আগে ওয়ালীউল্লাহ্ যখন দীর্ঘ দশ বছর পরে দেশে ফিরেছিলেন মাস খানেকের জন্য, তখন যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকের মনেই এই দীর্ঘ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুপুরুষ ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপ লেগে আছে। বিশেষ করে তাঁদের ক্ষেত্রে যারা তাঁকে এর পূর্বে আর কখনও দেখেন নি, শুধু তাঁর নাম শুনেছিলেন। হয়তো কিছু লেখাও পড়েছিলেন। তাঁর নিখুঁত চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছিলো একমাত্র চুলে। যদিও চুলে পাক ধরার বয়স তার পুরোপুরি হয়নি, তবু তাঁর মাথার অনেক চুলই সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের চেয়েও কিছুটা বেশি। নইলে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে স্বচ্ছন্দেই প্রাক-মধ্য-বয়সীদের সারিতেই বসিয়ে দেওয়া যেতো।

এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আমরা যে সাতজন অখ্যাত তরুণ মুসলিম বাঙলা সাহিত্যের মাঠে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে আধুনিকতার ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম এলোমেলোভাবে, ওয়ালীউল্লাহ্ সেই দলে ভিড়েছিলেন সবশেষে। ফররুখ, আহসান হাবীব, আবু রুশ্‌দ্, শওকত ওসমান, গোলাম কুদ্দুস, ওয়ালীউল্লাহ্ এবং আমাকে নিয়ে সেদিন কলকাতায় আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বেশ কিছুটা বিব্রতই বোধ করতেন। বিশেষ করে শওকত ওসমানের সান্নিধ্যে। ওয়েলেসলী স্ট্রীটে মুসলিম ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে শওকত ওসমান প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাধা দিয়ে হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন। বনগাঁয়ে আর এক সাহিত্য সম্মেলনে নজরুল ইসলামকে বক্রোক্তি করে শওকত এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে আমরা সভাস্থল থেকে পালাবার পথ পাইনে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এক দল লেখক গিয়েছিলেন পাণ্ডুয়া ভ্রমণে। হুগলীতে কবি গোলাম মোস্তফা তখন কলিজিয়েট স্কুলের হেড মাস্টার। তাঁর দরাজ মেহমানদারির সুনাম কে না জানতো ? আমরা স্বভাবতই তাঁর ঘাড়ে উঠে বসলাম। এমনি সময় শওকত ওসমান কানাকানি শুরু করে দিলেন তাঁর কোন্ কবিতা নাকি কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর নিজের নামে ছেপেছেন। ফররুখ তো মামলাই ঠুকে দিয়েছিলেন মওলানা আকরম খাঁর নামে, তিনি তাঁর একটা গান আত্মসাৎ করেছেন বলে। প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্র পরিষদের প্রথম সেক্রেটারী করা হলো আমাকে। সে বছরেই আবু সাঈদ চৌধুরী হয়েছিলেন কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। ঠিক মনে পড়ছে না, সম্ভবত পরবর্তী বছর মহিউদ্দিন আহমদকে করা হয় কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র পরিষদেরও সম্পাদক নির্বাচিত হই আমি। খুলনার দৌলতপুর কলেজ তাদের সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি করে আমাকে। আজকের পাঠক হয়তো ভাবছেন এতে এমন কি হলো ? যাঁরা কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস ঐতিহ্যের খবরাখবর রাখেন তাঁরা জানেন চারের দশকে এটা মুসলমানদের বেলায় ডালভাত ছিল না। আসলে এ সবই মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠার সময়ের কথা। সুযোগটা আমাদের পথে এসে গিয়েছিল। আমার একটা লেখা প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অধ্যাপক শশাঙ্ক শেখর বাগচী সেকালে তাঁর একটি বহুল প্রচারিত রচনা বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কবিতা, চতুরঙ্গ, পুর্বাশা, নিরুক্ত, অরণি ছাড়াও আনন্দবাজার, দেশ, যুগান্তর শারদীয়া সংখ্যায় কয়েক বছর ধরে বেরুচ্ছে আমার কবিতা। কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর জাপানী কবিতার অনুবাদ 'জাপানী ঝিনুক' বইটি উৎসর্গ করলেন আমাকে। গোলাম কুদ্দুসের লেখা ছাপছেন সজনীকান্ত দাশ তাঁর বহু বিতর্কিত অথচ জনপ্রিয় 'শনিবারের চিঠিতে'। ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের বই, তাঁর প্রথম বই, 'নয়নচারা' ছাপলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পূর্বাশা প্রকাশনী থেকে। কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম আমি রবীন্দ্র সন্দর্শনে। সেই সফরের যে খবর বেরুলো সংবাদপত্রে তা অনেকের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিলো। মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের মনন শাখার অধিবেশনে বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে প্রবন্ধটি পড়ে শেষ করতে না করতেই সে অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এই অর্বাচীন তরুণকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা সেই আলোচনাটির উপর একটা ছোট্ট সম্পাদকীয় লিখে অসন্তোষের আগুনে যে ইন্ধন যোগালো তার ফল আমাকে ভুগতে হয়েছিল। আমরা তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। এ সব কারণে আমরা যে খুব জনপ্রিয় ছিলাম না তা বলাই বাহুল্য। মাসিক মোহাম্মদীতে আমাদের কবিতা 'আধুনিকী' শিরোনামায় বর্জাইস টাইপে ছাপা হতো। আমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হাবিবুল্লাহ্ বাহার। তিনি শুধু আমাদের রচনা ছাপাতেনই না, হাতের কাছে যাকে পেতেন তাকে সে লেখা পড়েও শোনাতেন। আবু রুশ্‌দের প্রথম গল্পের বই 'রাজধানীতে ঝড়' ছেপেছিলেন তিনি। আমার প্রথম কবিতার বই 'নব বসন্ত'ও বেরিয়েছিলো তারই বুলবুল পাবলিশিং হাউজ থেকে। আমরা দুজন তখনও কলেজের ছাত্র। আজকের পাঠকেরা হয়তো লক্ষ্য করেন না বাঙলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার জোয়ার এসেছিল তিরিশের কোঠায়, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তীর সমবয়সী মুসলমান কবি লেখকেরা কেউই সেই আন্দোলনে শরিক হন নি। এমন কি সৈয়দ আলী আহসানের মতো সমকালীন সাহিত্যের পাঠকও এই পথে পঞ্চাশের মাঝামাঝি এসেই পা বাড়ান। আমাদের মত অর্বাচীনকেই এই ধারার লাঙল ধরতে হয়েছিল মুসলমান মানসের পড়ো জমিতে।

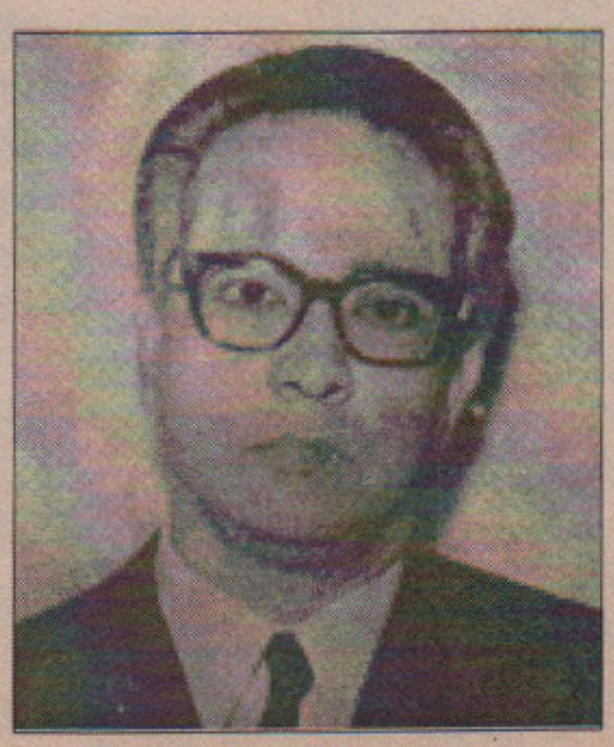

লেখক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্ আমাদের কিছু পরেই এসেছিলেন, পড়তেনও আমার এক ক্লাস নিচে। আমার ধারণা ছিল বয়সের দিক থেকেও তিনি আমার কিছু ছোট। রশীদ করীম ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আবিষ্কার

করলেন আমাদের দু'জনের জন্ম তারিখ এক। ১৫ই আগস্ট, ১৯২২। ওয়ালীউল্লাহ্ যতদিন বেঁচেছিলেন এ ব্যাপারটা আমাদের কারো চোখে পড়ে নি। আমাদের যৌবনে, কলকাতায়, আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন গোলাম কুদ্দুস। শেষদিকে আবু রুশ্‌দ্ ও শওকত ওসমান। ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে কখনসখন দেখা হত। ক্রিমেটেরিয়াম স্ট্রীটে বাহার সাহেবের বৈঠকে মাঝে মাঝে পেতাম তাঁকে। আমরা বসে আছি হঠাৎ ঢুকে ওয়ালীউল্লাহ্ দু'একটা কথা বলে চলে গেলেন। বাহার সাহেব সম্পর্কে ওর বড় ভাই ছিলেন। তাঁর কাছে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে কখনও সহজ হতে দেখি নি, যদিও এই ছোটবড়র ব্যাপারে বাহার সাহেবের মত উদার লোকের সন্ধান আজও পাই নি। সেকালে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে তেমন আড্ডা দিতে দেখি নি। খুব কম কথা বলতেন, ধীরে ধীরে প্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণে। চেহারায়, বিশেষ করে চোখে-মুখে, বুদ্ধির সুস্পষ্ট ছাপ, কিন্তু বেজায় লাজুক। যত কথা বলতেন তার চেয়ে কাজ করার ঝোঁক ছিল বেশি। সেই তরুণ বয়সেই প্রায় একাকী প্রকাশনায় নেমে পড়েছিলেন। হান্টারের The Indian Musalman বইটার পুনঃপ্রকাশ হলো তারপ্রকাশনা সংস্থা থেকে। Contemporary নাম দিয়ে একটা ইংরেজি পত্রিকাও যেন প্রকাশ করেছিলেন। ক'সংখ্যা বেরিয়েছিল আজ আর ঠিক মনে পড়ছে না। ওয়ালীউল্লাহ্ কোন কাজেই খুব মতামতি করতেন না। তাঁর ভেতরে যে আন্দোলন, বাইরে তার ছাপ খুব কমই পড়তো।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা সব চেয়ে জমে ওঠে ঢাকায় পঞ্চাশের মাঝামাঝি। অস্ট্রেলিয়ায় প্রেস এ্যাটাশির চাকরি থেকে ফিরিয়ে এনে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ঢাকায় আঞ্চলিক তথ্য অফিসে বদলি করে। এই পোস্টিং ওঁর একেবারেই পছন্দ হয় নি। এই সময় ওয়ালীউল্লাহ্ যতদিন ঢাকায় ছিলেন ওর মন তেমন ভাল ছিল না। হয়তো সারাদিন অনভিপ্রেত অফিসের কাজের গ্লানি ডুবিয়ে দিতে হামেশাই সন্ধ্যার দিকে ছুটে আসতেন আমার আজিমপুরের ফ্লাটে। সঙ্গে প্রায়ই সৈয়দ নুরুদ্দিন। রশীদ করীম তখন থাকতেন আমার বাসায়। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তুমুল আড্ডা চলতো। 'বহিপীর' নাটকটা লেখা হয়েছিল এই সময়। এক সন্ধ্যায় নাটকটি পড়া হলো নুরুদ্দিনের সেগুনবাগিচার বাসায়। মঞ্চ পরিচালনায় অভিনবত্ব থাকলেও, আমার কাছে প্রধান চরিত্রটি তেমন স্বাভাবিক মনে হয়নি। অসাধারণ কাণ্ড কারখানা ক'রে হাস্যরস অথবা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি– ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে পাঠকের প্রত্যাশা তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বিশেষ ক'রে 'লাল সালু' লেখার এতো বছর পরে। মুসলমান সমাজে পীরফকিরের ভণ্ডামি ওয়ালীউল্লাহ্‌কে খুবই নাড়া দিয়েছিল। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছিল সেকালে মুসলমান সমাজে গোঁড়ামির, কুসংস্কারের কুঁয়ো এক পূর্বাঞ্চলীয় শহরে। সম্ভবত সেই স্মৃতি তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি। 'লাল সালু'র মজিদ একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। কিন্তু তাঁর টাইপ চরিত্র সৃষ্টি আমার তেমন পছন্দ হয় নি। আমাদের সাহিত্যে এই জাতীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পেয়েছি মাহবুব উল আলমের 'মফিজনে'। সেই যে রাত্রে স্বামী নাছিরপুরের গদীনশীন পীর সৈয়দ বোরহানুদ্দীন এসে সোজা বসলেন নব বিবাহিতা স্ত্রী মফিজনের বিছানায়, বাতির দিকে চেয়ে আদেশ করলেন, বিবি, পায়ে ধরে ছালাম করুন, সেই লাখ কথার

ওরলি বিমানবন্দরে নেমে টেলিফোন করতেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র উৎফুল্ল গলা ভেসে এলো : এক্ষুণি শহর টার্মিনালে চলে এসো। আমি আসছি। টার্মিনালে পৌঁছে দেখি ওয়ালীউল্লাহ্ অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে ইবনে ইনসাকে দেখে খুব খুশি হলো বলে মনে হল না। ওর আচার আচরণে এমন দূতাবাসীয় পরিমার্জনা ছিল যে মনের ভাব মুখে ফুটতেই পারে না। ইচ্ছে ছিল ওর সীন নদীর ওপরে এপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে ক'দিন গল্পসল্প করা। বাড়িতে তখন ওর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা ছিল না। ইনসা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত বাড়িয়ে দিল, তোমরা যাও, খোদা হাফেজ।

এক কথা কি কখনও ভুলতে পারবো ?

ভয়ে ভয়ে বলি, 'লাল সালু'ও আমি তিনবারে পড়েছি। প্রথম বিশ তিরিশ পৃষ্ঠা দু'বারে পার হয়ে তৃতীয় চেষ্টায় বাকি বইটা আমি গড় গড় ক'রে প'ড়ে ফেলে ভাবি নোয়াখালির ওই ন্যাড়া বর্ণনাটি উপন্যাসের জন্য কি এতই জরুরী ছিল। ওয়ালীউল্লাহ্‌কে অবশ্য এ কথা কখনও জিজ্ঞেস করা হয় নি। এখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

একবার দেশের বাইরে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে আমার ক'দিন কেটেছিল অবিস্মরণীয় আনন্দে। বেলজীয়ামের ক্লোক্‌লা জুতে দ্বিতীয় বাই অ্যানুয়েল ইন্টারন্যাশনাল অব পয়েট্রিতে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ক'রে বিলেতে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে প্যারিসে এলাম প্রধানত ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে আড্ডা দিতে। তিনি তখন প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসে প্রেস এটাশী। খবর দিয়েছিলাম আমার জন্য একটা মাঝারি ধরনের হোটেল কামরা ঠিক করে রাখতে, সঙ্গে গোসলখানা থাকলেই হলো। অবশ্যি তা আগেভাগে লিখি নি। আমার সঙ্গে ছিলেন উর্দু লেখক ইবনে ইনসা। ওরলি বিমানবন্দরে নেমে টেলিফোন করতেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র উৎফুল্ল গলা ভেসে এলো : এক্ষুণি শহর টার্মিনালে চলে এসো। আমি আসছি। টার্মিনালে পৌঁছে দেখি ওয়ালীউল্লাহ্ অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে ইবনে ইনসাকে দেখে খুব খুশি হলো বলে মনে হল না। ওর আচার আচরণে এমন দূতাবাসীয় পরিমার্জনা ছিল যে মনের ভাব মুখে ফুটতেই পারে না। ইচ্ছে ছিল ওর সীন নদীর ওপরে এপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে ক'দিন গল্পসল্প করা। বাড়িতে তখন ওর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা ছিল না। ইনসা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত বাড়িয়ে দিল, তোমরা যাও, খোদা হাফেজ। আমি হোটেলে উঠছি। দুজনে দেশ থেকে একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে ইউরোপ ঘুরছি, ওকে ছেড়ে যাই কি ক'রে। রফা হল সারাদিন দু'জনে ঘুরবো। সন্ধ্যায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাসায় যেতে হবে আমাকে।

ষাট সালের দিকে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঢাকা থেকে একটা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করি 'সংলাপ' নাম দিয়ে। উদ্যোগটা ছিল প্রধানত আমারই। কিন্তু সরকারি চাকুরে হিসেবে পত্রিকা প্রকাশনার ঝক্কির কথাটা ভেবে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনকে সঙ্গে নেয়া হ'ল সম্পাদক হিসেবে। ঢাকায় তখন ভালো পত্র-পত্রিকার খুবই অভাব। এদিকে কলকাতার কাগজপত্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয় গেছে। ইচ্ছে ছিল 'কবিতা' 'চতুরঙ্গ' 'পরিচয়' জাতীয় কিছু একটা করা যায় কিনা। সে প্রচেষ্টা সফল হ'তে পারল না। ছ'সাতটা সংখ্যা বের করবার পর বিদেশে চাকুরি নিয়ে আমাকে চলে যেতে হয়। সজ্জাদ সাহেব তার পরও সম্ভবত দু'একটা সংখ্যা বের করেছিলেন কিন্তু আমি আর সম্পাদক থাকতে রাজি হই নি। সে যা-ই হোক, 'সংলাপ' বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা সাড়া পড়েছিল সাহিত্যিক মহলে। বিশেষ ক'রে তরুণ লেখকরা এগিয়ে এলেন তাঁদের সেরা লেখা নিয়ে। শামসুর রাহমানের তারুণ্য তখন খসে যাচ্ছে, জীবনানন্দের আচ্ছন্নতা ফিকে হয়ে আসছে, নিজের কথা নিজের মত ক'রে বলার সাহস বাড়ছে। সংলাপের প্রতি সংখ্যায় পড়লো তার ছাপ। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর 'রক্তগোলাপ' গল্পটি দিয়েছিলেন সংলাপে। ওর চেয়ে ভালো শামসুল হকের গল্প আমি আর পড়ি নি। চল্লিশের আমরা তো ছিলামই, শহীদ কাদরী এবং আল মাহমুদের মত তরুণরাও এসে জুটেছিল

সংলাপে। রশীদ করীম অনেকদিন পর আবার নতুন উদ্যমে লিখতে শুরু করলেন। প্যারিস যখন যাই আমার সঙ্গে ছিল সংলাপের কয়েকটা সংখ্যা। পড়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র বেজায় ভালো লেগেছিল। বিদেশে ওর লেখার চর্চা প্রায় থেমে গেছে। সংলাপ হাতে পেয়ে ওর লেখার ইচ্ছাটা আবার নতুন ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি ইউরোপ থেকে দেশে ফিরতে না ফিরতেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক পেলাম। সংলাপে দু'সংখ্যায় বেরিয়েছিল লেখাটা। ওর প্রুফ দেখতে গিয়ে আমাকে পায় পায় হোঁচট খেতে হয়। অনেকদিন বিদেশে থেকে বাংলা বইপত্তর পড়তে না পেরে নিয়মিত লেখার সুযোগ হারিয়ে বাংলার কান যেন ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঠিক ছিল না। ওর পরবর্তী সব লেখার মধ্যেই কি সেটা ধরা পড়ে? 'কাঁদো নদী কাঁদো' পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল কথাটা।

প্রবাসে আমি নিজেও এক সময় হারিয়ে ফেলেছিলাম লেখার উৎসাহ। বিদেশে যে পরিবেশে আমাদের দিন কাটতো সেটা সাহিত্যচর্চার সহায়ক তো নয়ই, উপযোগীও ছিলো না। অমিয় চক্রবর্তীর কথা আমি ভুলে যাই নি। বিদেশে থাকলেও, লেখাপড়া শিক্ষা সংস্কৃতিই ছিলো তাঁর জীবনধারণের উপাদান। ফলে তাঁর লেখায় ভাঁটা পড়ে নি। পড়ে নি পাবলো নেরুদার বেলা, জর্জ সেফারীশের ক্ষেত্রেও। কুটনীতিজ্ঞের চাকরিতে জীবনের একটা বড় অংশ কাটালেও ওঁদের অবস্থান এতো উঁচুতে ছিলো যে পেশার বাইরে নিজের নেশা কাউকে ছাড়তে, কমাতে হয় নি। তাছাড়া ওঁদের ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈপরীত্য তেমন দুর্লঙ্ঘ্য ছিলো না। যা-ই হোক, প্রবাস লেখক ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বঞ্চিতই করে নি, তাঁর লেখার খোরাকও জুগিয়েছিলো। অবচেতনের যে প্রবাহ তার শেষ দুটি উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যে সিক্ত করেছে, পশ্চিমের সাহিত্য সংস্কৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন, তার স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো তা সম্ভব হয়েছিলো।

২.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, তার পরদিন সকালে অফিসে বসে টেলিগ্রামে সে খবর পেয়ে শুধু চমকে উঠি নি, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সময়টা ছিল ভয়ংকর বিভীষিকাপূর্ণ। অফিসে কাজকর্ম তেমন নেই। প্রায় সারাদিন বসে গলা নামিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা। সে আবহাওয়ায় আড্ডার ছোঁয়াচ তো লাগতই না বরং অমঙ্গলের ভারে ভারাক্রান্ত ছিলো সর্বক্ষণ। প্রতি মুহূর্ত কোন না কোন দুঃসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনায় শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। এমন সময়ে, যখন তাকে আমাদের খুবই দরকার, প্যারিসে ওয়ালীউল্লাহ্‌র হঠাৎ মৃত্যু প্রায় বজ্রাঘাতের মত। বয়সের হিসেবে পঞ্চাশও পার হয় নি। অসুখ-বিসুখ নেই, শরীর স্বাস্থ্য অটুট, অবিরাম লিখছেন, পড়ছেন, ঘোরাঘুরি চলছে। মন খুব ভাল না থাকলেও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় ছেদ পড়ে নি। সময়টা যেমন সকল বঙালির জন্যে ছিলো দুর্দিন, ওয়ালীউল্লাহ্‌র বেলায় তা আরও দঃস্বপ্নের। চাকরি হারিয়েছেন, পাকিস্তানে ফেরা অসম্ভব। ভবিষ্যৎ বেশ খানিকটা অনিশ্চিত। তবু তিনি যে ভেঙ্গে পড়েছেন, অন্ততঃ মানসিক দিক থেকে, তারও কোন লক্ষণ ছিলো না। এ ধরনের ঠোক্কর জীবনে এই তো প্রথম নয়। অফিসের অলিগলিতে চোরা-গোপ্তা মার আগেও খেয়েছেন, কখনো ভারসাম্য হারান নি। তবু নিয়তি তাকে হঠাৎই এমন নির্বিচারে, নির্মমভাবে হরণ করবে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। অসহায় বোধ করা ছাড়া উপায় কি? মৃত্যুর কোন সময় অসময় নেই, বয়স নেই, কার কখন ডাক আসে কেউ জানে না। সুতরাং তৈরি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ইশারা পেলেই যে তৈরি হওয়া যায়, তাও নয়। আমাদের মত ওয়ালীউল্লাহ্‌ও নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন নি। একটুও তৈরি হন নি।

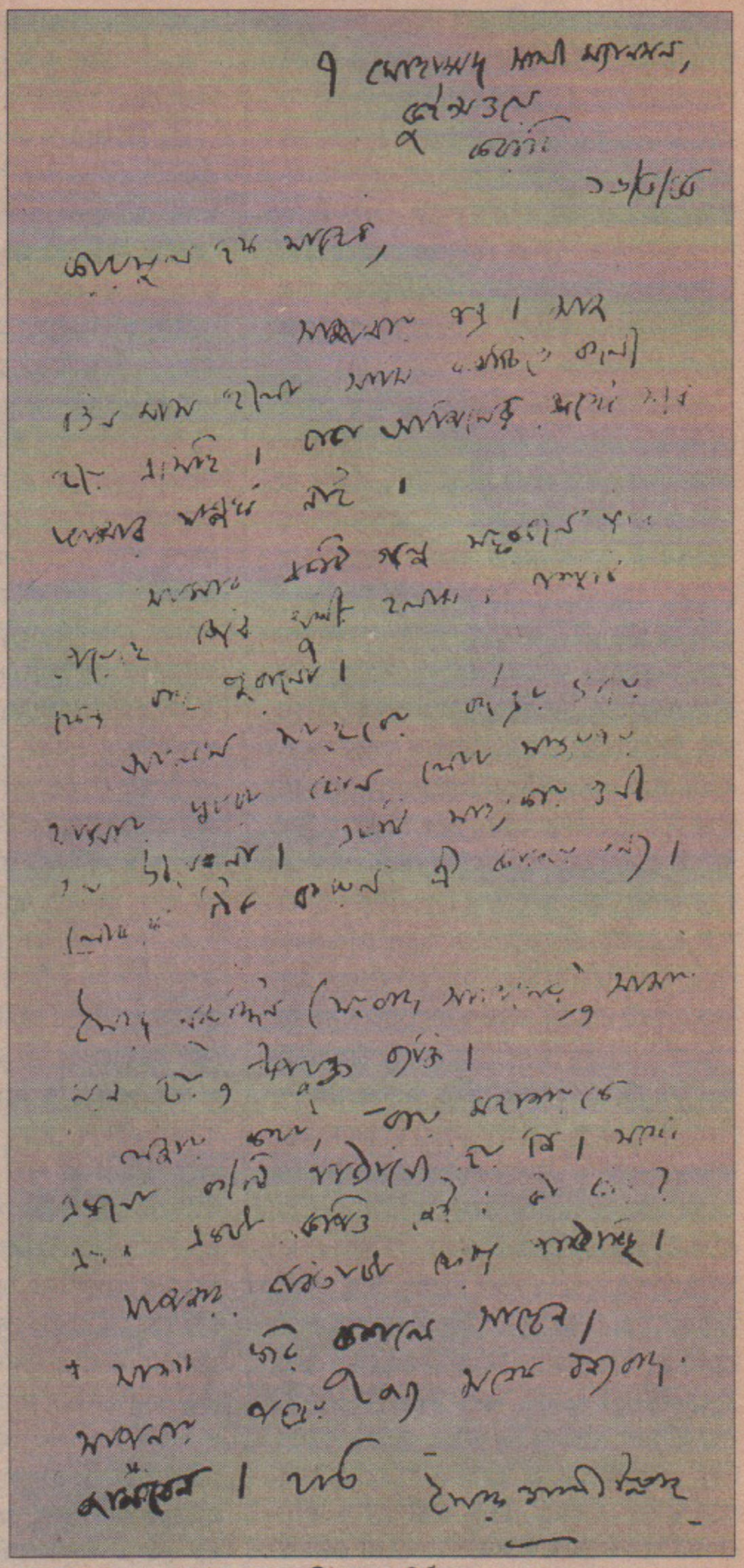

কায়সুল হককে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিঠি

এই যে একান্ত নীরবে, অত্যন্ত গোপনে তিনি জীবন থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, আজ এ বিষয়টি ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র পক্ষে এর চেয়ে আরো সুন্দর, শোভন, শালীন চিরনিষ্ক্রমণ আর কি হতে পারতো সাহিত্য ক্ষেত্রে খুব একটা হৈ চৈ রৈ রৈ করে ঘোড়া ছুটিয়ে না এলেও তিনি একটু একটু করে ধীর স্থির নিশ্চিত পা ফেলে অগ্রসর হয়েছিলেন। শুরু করার পাঁচ'ছ বছরের মধ্যেই তাঁর সেরা বই লিখতে পেরেছিলেন। বেঁচে থাকলে তাঁর হাত দিয়ে আরো কিছু ভাল গল্প উপন্যাস নাটক হয়তো আমরা পেতে পারতাম। কিন্তু তাঁর মত সৃষ্টি ক্ষমতার মধ্যাহ্নে চলে যাওয়ার সৌভাগ্য ক'জনার

ভাগ্যে ঘটে ? বাংলা সাহিত্যের গল্পলেখকের সঙ্গে তুলনায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখার পরিমাণ সীমিত মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি যা-ই লিখেছেন তার মধ্যে রুচি ও মননের যে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর, আমাদের সাহিত্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা অনস্বীকার্য। তাঁর কোন লেখার মান পড়ে গেছে এ কথা কারো কাছে শুনবার আগেই যে তিনি কলম ছেড়ে হাত উঠিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন, ওয়ালীউল্লাহ্‌কে যাঁরা জানতেন তাঁরা জানেন তার পক্ষে এটা কত স্বাভাবিক ছিলো।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র মত অভিজাত আমি খুব কমই দেখেছি, তার শরীর এবং স্বাস্থ্য ছিল পৌরুষদীপ্ত। লম্বা অথচ ঢ্যাঙা নয়। গায়ের রং ফর্সা চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। যে কাপড়-চোপড় পরতেন তা তাকে কতটা মানায়, দামের চেয়ে সেটাই তার কাছে বিবেচনার বিষয় ছিল। হাঁটতেন চলতেন ধীরে সুস্থে। কথা বলতেন কম এবং নিচুস্বরে। শুনতেন বেশি। তাঁকে আমি কখনও রাগতে দেখিনি। কারও ব্যবহারে ক্ষুণ্ন হলে গলা চড়তো না। কড়া কথাও বলতেন না। একটা দুঃখের সুর ফুটতো গলায়। বন্ধু-বান্ধবও খুবই সীমিত। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে মিশতেন দিল খুলে কথা বলতেন, মনে কিছু না রেখে। অনেকে উন্নাসিকতা বলে ভুল করতেন। বৈদেশিকতা বলে ভাবতেন। জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় বিদেশে কাটাতে হয়েছিল বলেই হয়তো মনের দিক থেকেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র হাবভাবে অনেকখানি পাশ্চাত্য ঢং এসে গিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল বাঙালির। আসলে তাঁর আচার-আচরণ ছিলো খুবই সহজ এবং অনাড়ম্বর। চেহারায় এবং ব্যবহারে পুরোপুরি নাগরিক। শহরে বাস করেও যাদের গ্রাম্যতা যায় না, তাদের মতো নয়। তাঁর পক্ষে উচুদরের ব্যুরোক্রাট অথবা কুটনীতি এমন কি অধ্যাপক হওয়াও সম্ভব ছিলো। কিন্তু এসব কিছু না হয়ে তিনি যে লেখক হলেন শুধু তাই নয়; গল্প, উপন্যাস, নাটক লেখক হলেন, কবি বা প্রাবন্ধিকের মতো একাকী অথবা নিসঙ্গ কর্মী নয়, এটা অনেকের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ এ অসম্ভাব্য পরিণতি সম্ভব করেছিলেন তাঁর মানসিক প্রস্তুতিতে। তিনি লেখক হতেই চেয়েছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই এবং তার জন্য তখন থেকেই তৈরি হয়েছিলেন। জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজনে আর যা-ই করতে হোক তিনি তার সংকল্প থেকে কখনও বিচ্যুত হন নি। তার ফলে অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে বসেও লিখেছেন বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে, গ্রামের মানুষ সম্পর্কে। ছেলেবেলায় যা দেখেছিলেন। তাঁর আভিজাত্য বংশের, অর্থের অথবা পদমর্যাদার ছিলো না। ছিলো মননের, মানসিকতার, রুচির। বেঁচে থাকতেই তিনি তাঁর লেখার যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গেই হোক অথবা অন্য কারো বেলায়ই হোক তার ব্যবহারে আত্মশ্লাঘা কিংবা ভাবালুতার কিছুমাত্র ছাপ পড়ে নি।

ওয়ালীউল্লাহ্‌ আর নতুন কিছু লিখবেন না। এখন অন্তত লেখক হিসেবে তাঁর মূল্যায়নের সময় এসেছে। জনপ্রিয় লেখক বলতে যা বোঝায়, তিনি তা খুব একটা ছিলেন, তা নয়। তাঁর 'লাল সালু'র অবশ্য দশটা সংস্করণ বেরিয়েছে। কিন্তু তা হয়েছে ওই বইটা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ার পরেই। তাঁর গল্পের বই 'নয়নচারা' আর ছাপা হয় নি। তাঁর নাটকের অভিনয় হয় না, যদিও ঢাকায় এখন বেশ কয়েকটি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এবং শুনতে পাই নিরীক্ষাধর্মী নাটক সম্পর্কে তারা উৎসাহী। বিদেশী নাটক অনুবাদ করেও অভিনয় করেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌র নয়, আমাদেরই দুর্ভাগ্য পাঠকদের মনে তিনি এখনও দাগ কাটতে পারেন নি। তাঁর জনপ্রিয়তা লেখক সমালোচক সমাজে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ এখনও লেখকদের লেখক। কিন্তু পাঠকদের লেখক বাংলাদেশে কে বা কারা ? কার বই বাংলাদেশে কাটে ? এমন কেউ আছেন বলে আমি জানি না। বইয়ের বাজার নেই বলেই বই ছাপা হয় না। জসীমউদ্‌দীনও নিজে টাকা খরচ করে বই ছাপাতেন। একজন প্রবীণ ঔপন্যাসিককে বাড়ি বন্ধক দিয়ে তার উপন্যাস ছাপতে হয়েছিল। অনেক ভাল বই প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার পর পড়ে আছে। প্রকাশকরা বই ছাপতে এগিয়ে আসছেন না, কেননা বইয়ের ব্যবসা এদেশে তেমন লাভজনক নয়। বইয়ের চেয়ে চামড়া বা পাট বা অন্য কিছুতে টাকা খাঁটালে সে টাকা সুদ এবং লাভ সমেত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার সম্ভাবনা। লেখক এবং পাঠকের সম্পর্কটাও অর্থনীতির আদিসূত্র মেনে চলে। চাহিদা না থাকলে সরবরাহ ব্যাহত হবেই। সরবরাহ কখনও কখনও চাহিদার সৃষ্টি করে, কিন্তু তার জন্য যে সামাজিক-বাণীজ্যিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন আমাদের দেশে তা বিন্দুমাত্র নেই। পাঠক সৃষ্টির তেমন কোন চেষ্টাই হচ্ছে না। দেশে লাইব্রেরী নেই। স্কুল, কলেজ পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই কেনে না, বই-পত্তর উপহার দেয়ার সামাজিক স্বভাব, কি ধনী কি মধ্যবিত্ত কোন শ্রেণীর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েনি, বইয়ের বিজ্ঞাপনও নিয়মিত কোথায়ও ছাপা হয় না এমন কি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বইয়ের আলোচনাও কালে-ভদ্রে হয়। নিয়মিত ব্যবস্থা হিসেবে তো নয়ই। তরুণরা বরং চেষ্টা তদবির করে বই-পত্তর ছাপান, পত্র-পত্রিকায় আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এমন অবস্থায় প্রকাশকরা যখন বই ছাপেন তখন এমন ভাব দেখান যে লেখকদের তারা যেন করুণা করছেন। লেখকের বদান্যতার প্রশ্নই ওঠে না। স্বভাবতঃই বইয়ের ভালমন্দের উপর তার প্রকাশের সম্ভাবনা নির্ভর করে না, করে অন্য অনেক কিছুর উপর, বইয়ের বিচারে যেগুলি সম্পূর্ণ অবান্তর। ফলে বই ছাপার বেলায় দেখা যায় মুড়ি মুড়কির একই দাম। লেখার মূল্যায়নের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। জসীমউদ্‌দীন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দুঃখ করে বলেছিলেন, অনেক কাগজ তাঁর কবিতা ছাপতে চায় না। এক সাপ্তাহিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক লেখা চেয়ে কবিতা পেয়ে তাঁকে বলেছিলেন, আপনার গদ্য চমৎকার। আমাদের একটা গদ্য লেখা দিলে ভালো হয়। জসীমউদ্‌দীন সত্যিই খুব ভালো গদ্য লিখতেন, কিন্তু তাঁর কবিতা যে আর ছাপার যোগ্য ছিলো না, এও বিশ্বাস করতে হবে ? কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা ঘটেছিলো। এ রকম অবস্থায় ওয়ালীউল্লাহ্‌ যে অন্ততঃ লেখক সমালোচকদের লেখক হতে পেরেছিলেন, সে কি কম কথা।

আগেই বলেছি ওয়ালীউল্লাহ্‌ লেখক না হয়ে আরও অনেক কিছু করতে পারতেন সমান পারদর্শিতায়। জীবিকার জন্য লেখা কোন কাজে আসবে না, তার অজানা ছিলো না। তবু তিনি লেখক হতেই চেয়েছিলেন। লিখে নাম করবেন অথবা অমর হবেন বলে নয়। প্রথমদিকে সমাজের প্রতি একটা দায়বোধ তাঁর ছিলো। সমাজের প্রতি মমতায় ভালোবাসায় তাঁর কলম ধরার ইচ্ছে হয়। গ্রামীণ মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা তাঁর হৃদয়ে কাঁটার মতো ফুটতো। এর একটা আমূল পরিবর্তন আনার কথা তিনি ভাবতেন। বক্তৃতা করে নয়, সমাজের আসল চেহারাটা দেশের লোকের চোখের সম্মুখে নির্ভয়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন শিল্পীর কলমে যাতে তারা সে চেহারা দেখে শিউরে ওঠে, নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা ভাবতে শেখে। কিন্তু এও বাহ্য। তিনি লেখক হয়েছিলেন এই জন্যে যে লেখার মধ্যেই তিনি তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতেন। লেখক না হয়ে তাঁর উপায় ছিলো না। সব লেখকই এই জন্যে লেখক হয় বলে আমার ধারণা।

ওয়ালীউল্লাহ্‌ বেঁচে থাকতেই সব মহল থেকেই লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, নিজস্বতার প্রমাণ দিয়ে তার বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন। তার বৈশিষ্ট্য কোথায় ? তিনি কি করেছেন যার জন্য তাঁকে আমরা মনে রাখবো ?

ওয়ালীউল্লাহ্‌ যখন লিখতে শুরু করেছিলেন এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, তখন বাংলার মুসলমান সমাজ সবেমাত্র রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক নিপীড়ন-নিষ্পেষণের শিকল খুলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। শিকলটা তখনও খোলেনি, খোলার চেষ্টা হচ্ছে কেবল। অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, দুঃসহ

দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত সমাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় তার ভাঙা নৌকা আরও বেসামাল, টলটলায়মান। তার মানবিক মূল্যবোধও অধঃপতিত। পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজে উনিশ শতকে যে নব-জাগরণের জোয়ার, মুসলমানদের মধ্যে তার ঢেউ পৌঁছলো না। সামাজিক, আর্থনীতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির বেলায়ও। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেও মুসলমানরা মধ্যযুগের পুঁথি নিয়ে আছে। মুসলমান গল্প উপন্যাস লেখকরা তখনও সামন্ততন্ত্রের আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এ পর্যন্ত তাদের রচনার শ্রেষ্ঠ ফসল মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু', নজিবুর রহমানের 'আনোয়ারা', কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ্'। আধুনিক মনের নব্যজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং লিবারিলিজম যার মূল ভিত্তি তার প্রথম প্রকাশ দেখা গেলো মাহবুব-উল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী'-তে। কিন্তু নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্‌দীন পার হয়ে চল্লিশের দশকে তরুণ মুসলমান কবিরা যে পথে পা বাড়ালেন, গদ্যে আবু রুশ্‌দ, শওকত ওসমান ও ওয়ালীউল্লাহ্ সেই পথের প্রথম পথিক। যে প্রাচীন গ্রামীণ জীবনের চত্বরে মুসলমান সমাজ আটকে ছিলো, তার সঙ্গে আবু রুশ্‌দ নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ পান নি। তিনি আজীবন শহুরে, আধা-শহুরে মানুষ। ফলে মুসলমান সমাজের প্রধানাংশ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি ছিলো সীমাবদ্ধ। কাছ থেকে না দেখার জন্যেই হয়তো এদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা তেমন ঘটেনি। সামান্য কিছু লোক ছাড়া তিনি মুসলমান সমাজের ভেতরে ঢোকার চেষ্টাই যেন করলেন না। শওকত ওসমান অবশ্য সমাজকে খুব কাছ থেকেই দেখেছিলেন। কিন্তু যে নৈর্ব্যক্তিকতা দৃষ্টির স্বচ্ছতা আনে, শিল্পকে সার্থকতার পথে নিয়ে যায়, তার প্রতি তার অনীহা যেন সীমাহীন। যেন ইচ্ছে করেই একটা অস্থির চাঞ্চল্য এবং বিশ্বাসের আসক্তিতে তিনি ভাবালুতার চোরাবালিতে আটকে গেলেন। রুচির শাসন সব সময় মানতে চাইলেন না। শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠলেও যে গ্রামীণ জীবন বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রধান ও আসল অংশ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চোখ সেদিকেই নিবদ্ধ হলো। দূর থেকে দেখলেন না, সাময়িক আবেগের বশেও না। এই সমাজের অধঃপতনের নির্যাস তিনি ছেঁকে তুলে আনলেন তাঁর অবিস্মরণীয় রঙে আঁকলেন সেই সমাজের ছবি। ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির অচলায়তন ভাঙতে এগিয়ে এলেন আধুনিক মানবীয়তার শক্তিতে। ধর্মকে যারা ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের নিয়ে এর আগে আর কেউ লেখে নি তা নয়, কিন্তু আধুনিক চিত্তের আলো ফেলে ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন ভাবে তাকে ভাবালুতাহীন দৃষ্টির রশ্মিকেন্দ্রে ধরেছেন, তার পূর্বে তা আর কেউ করেন নি বলেই আমার বিশ্বাস। মজিদের যে চরিত্র তিনি এঁকেছেন, তা শুধু নতুনই নয়, অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সম্বল করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজের জীবিকা ও মর্যাদা অর্জনের মধ্যেই সে অন্যূনতা লক্ষণীয় নয়, বরং এই সবের ফাঁকে মাঝে-মধ্যে তার মনে যে আশঙ্কা দেখা দেয়, নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ঠিক নয়, খানিকটা সন্দেহ

●●

ওয়ালীউল্লাহ্ লেখক না হয়ে আরও অনেক কিছু করতে পারতেন সমান পারদর্শিতায়। জীবিকার জন্য লেখা কোন কাজে আসবে না, তার অজানা ছিলো না। তবু তিনি লেখক হতেই চেয়েছিলেন। লিখে নাম করবেন অথবা অমর হবেন বলে নয়। প্রথমদিকে সমাজের প্রতি একটা দায়বোধ তাঁর ছিলো। সমাজের প্রতি মমতায় ভালোবাসায় তাঁর কলম ধরার ইচ্ছে হয়। গ্রামীণ মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা তাঁর হৃদয়ে কাঁটার মতো ফুটতো। এর একটা আমূল পরিবর্তন আনার কথা তিনি ভাবতেন। বক্তৃতা করে নয়, সমাজের আসল চেহারাটা দেশের লোকের চোখের সম্মুখে নির্ভয়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন শিল্পীর কলমে যাতে তারা সে চেহারা দেখে শিউরে ওঠে, নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা ভাবতে শেখে।

●●

জাগে, এইখানেই চরিত্র চিত্রণে ওয়ালীউল্লাহ্‌র শৈল্পিক সার্থকতা। লাল সালু'র নায়ক শুধু খল নয়, মানুষ হিসেবে বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে। 'লাল সালু' আমাদের প্রথম সার্থক আধুনিক উপন্যাস।

সব লেখকেরই মতো ওয়ালীউল্লাহ্‌ও যদিও পুনরাবৃত্তিতে বিশ্বাস করতেন না, তবু তাঁর কিছু পরবর্তীকালে লেখা বহিপীর নাটকের বিষয়বস্তু 'লাল সালু'র সেই ধর্মব্যবসায়ীরই আর এক সংস্করণ। আর এক ভণ্ড পীরের মুখোশ উন্মোচনের বাইরে এই বইতে বিশেষ কোন অন্তঃদৃষ্টি অথবা নতুনত্বের স্বাদ আমি পাই নি। প্রধানতঃ সংলাপের ভাষার মাধ্যমে পীর সাহেবের চরিত্র চিত্রণের প্রচেষ্টায় নতুনত্ব কিছু নেই, বরং বিবাহিত স্ত্রীকে হারিয়েও তিনি সে ব্যাপারটা যেমন সহজে হজম করে গেলেন তার মধ্যেই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

'লাল সালু'র পর ওয়ালীউল্লাহ্ আরও দু'টি উপন্যাস লিখেছিলেন। 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'। অনেক দিনের ব্যবধানে শুধু তাই নয়, এ বইগুলো সম্পূর্ণ বিদেশে বসে লেখা। বিষয় এবং বিন্যাসে এই দু'টি উপন্যাস তার ইতিপূর্বে লেখা অন্য সমস্ত রচনা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, যদিও পটভূমিকা এবং পরিবেশ সেই বাংলাদেশের গ্রাম্য প্রকৃতি এবং চরিত্রগুলোও সেই মুসলমান সমাজের নিচের তলার মানুষ। য়ুরোপ, আমেরিকার নতুন উপন্যাসে মন বিকলন ও চেতনা প্রবাহের ব্যবহার যে নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য এনেছে, দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার সময়ে ওয়ালীউল্লাহ্ তার স্বাদ যেমনভাবে পেয়েছিলেন, অন্য কোন বাঙালি লেখকের সে সৌভাগ্য হয় নি, যদিও জয়েস, কাফকা অথবা ক্যামুর রচনার রসোপলব্ধির জন্য প্রবাসবাসের প্রয়োজন নেই, তবু প্রত্যক্ষ পরিবেশে পরিমণ্ডল দেখা এবং উপভোগ ও দূর থেকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার মধ্য তফাৎ নেই, এ কথা হলফ করে বলতে পারবো না। চাঁদের অমাবস্যা'য় রহস্য উদ্ঘাটনের স্বাদ নয়, যুবক গ্রাম্য শিক্ষকের আত্মবিশ্লেষণের এমন কি আত্মনিগ্রহের প্রচেষ্টাই ওয়ালীউল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। আশ্চর্য ইঙ্গিতময়তায় তিনি তার তৈরি করা নাটকের চরিত্রে জাল বুনেছেন এবং তা ছাড়িয়েছেন। এই উপন্যাসে পটভূমি এবং পরিবেশ প্রায় অবান্তর। নায়ক যেকোন দেশের যে কোন সমাজের হতে পারতো। ঘটনাটিও। বরং অর্ধশিক্ষিত বাঙালি যুবক গ্রাম্য শিক্ষক যেভাবে তার চেতনা ও অবচেতনের বিচার বিশ্লেষণ করছে, চরিত্র হিসেবে তা বিশ্বাসের পরিধি পার হয়ে যায় নাকি? 'কাঁদো নদী কাঁদো'র গল্পাংশ বাহ্য, মুখ্য চরিত্র চিত্রণ এবং ঘটনা বর্ণনায় ও বিন্যাসে অভিনবত্ব। গল্পের জাল নয়, ওয়ালীউল্লাহ কথার জাল বুনছেন। একটা অমঙ্গলের ইশারা সমস্ত উপন্যাসে, কিন্তু লতার বিশ্বাস্য প্রতিফলন ঘটেছে কি? বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক অনিবার্যতা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। তবু এই দু'টি উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা উপন্যাসের দিগন্তকে যেভাবে প্রসারিত করেছেন, তার জন্য তাঁকে আমরা কখনও ভুলবো না। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌কে আমরা চিরকল মনে রাখবো তার 'লাল সালু'র জন্যে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, তাঁর উত্তর-সাধনা

বশীর আল্‌হেলাল

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে নিয়ে আমি এর আগে লিখেছি, বার তিনেক লিখেছি। প্রধানত তাঁর উপন্যাস তিনটিকে অবলম্বন করেই যা বলার বলেছি, গল্পগুলি সম্পর্কে সেভাবে বলা হয়নি। তাঁর সৃষ্টিপ্রয়াসের উন্মেষের ও তার বিকাশের ধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বরং 'নয়নচারা' সঙ্কলনের গল্পগুলি সম্পর্কে কিছু বলেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় সঙ্কলনের গল্পগুলি সম্পর্কে সে-রকমের আলোচনা করেছি বলে মনে পড়ে না। তার করার দরকার ছিল। একসময় তাঁর ওই শেষোক্ত গল্পগুলো আমার খুব ভালো লেগেছিল। আবার যদি ওগুলোকে পড়ি হয়তো মনে হতে পারে ওই ছোটগল্পেই তাঁর অধিকার উপন্যাসের তুলনায় বেশি।

গল্পগুলোকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত ছিল, বিশেষ করে প্রধানতর বা শ্রেষ্ঠতর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে যখন ওগুলোতে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বলে আমার মনে হচ্ছে। তবে তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে এখানে-ওখানে আলোচনা করেছি বলেও যেন মনে পড়ে। বিশেষ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-উত্তর আমাদের ছোটগল্প লেখক দু-একজন যাঁদের উপর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রভাব লক্ষ্যগোচরভাবে পড়েছে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও ওই ছোটগল্পগুলো সম্পর্কে, বিশেষ করে ওগুলোর বিশিষ্ট ঝোঁক সম্পর্কে সামান্য সামান্য আলোচনা করা হয়ে থাকতে পারে। এ-ছাড়া একটু বিস্তৃতভাবে যা করেছি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর বৈদেশিক প্রভাবের, আমি যতটুক পেয়েছি, তার সূত্রগুলো দেয়া। আর যে দিকটা নিয়ে ভালো রকম আলোচনার দরকার সে তাঁর ভাষা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই ভাষাকে আমি খুব মূল্য দিয়েছি, অনেকেই দিয়েছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমাদের কথাসাহিত্যের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত ও বৈশিষ্ট্যের ধারার মধ্যে ফেলে তাঁর ভাষার মূল্য বিচার আরো ভালো করে করা দরকার। সেই আলোচনার পক্ষে সহায়ক হতে পারে এমন অন্তত একটি ইঙ্গিত বর্তমান আলোচনায় করা যায় কিনা হয়তো দেখব।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে মেজাজের লেখক, তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে বসলেই, প্রতিবারই তাঁর লেখা ভালো করে পড়া দরকার। বিশেষ করে আমার সব সময় সবকিছু মনে থাকে না। তাই বর্তমান আলোচনা প্রণালীবদ্ধ গোছালো কিছু নয়; সহজ এলোমেলো লেখা। সেইভাবেই এটাকে পড়তে হবে।

বৈদেশিক প্রভাব

আমি দেখেছি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর বৈদেশিক প্রভাবের ব্যাপারটাকে অনেকে গুরুত্ব দিতে চান না। প্রতিবাদও করেন না, কিন্তু কথা উঠলে আনমনা হয়ে যান। এর দুই কারণই একেবারে স্থূল প্রকৃতির। ক্রমে ক্রমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমাদের সাহিত্যে এমন বড় আসন পেয়েছেন যে ওতে ঘা লাগলে তাঁর অনুরাগীরা তাঁদের গায়ে ঘা লাগল বলে মনে করেন। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে অনুকরণ কেন খারাপ এই জিনিসটাই বহুতর পাঠক বুঝতে পারেন না। যেমন টেলিভিশনের নাটক। খুব জমিয়ে অভিনয় হলো। তারপর ওটা অনুকরণ করা না নকল করা ওই নিয়ে দর্শক মাথা ঘামাতে চান না।

এই তুলনা সম্পূর্ণ ঠিক হলো কিনা জানি না। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর বৈদেশিক প্রভাবের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এই কারণে যে, আমাদের সাহিত্যে, ছোট হোক বড় হোক, তিনি একটা ধারার সৃষ্টি করেছেন। বৈদেশিক প্রভাব এমনিতে কোনো অভিনব ব্যাপার নয়। বৈদেশিক প্রভাব কখনো অবধারিত হয়, কখনো প্রয়োজনীয়ও হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষার সংশ্রব ও নৈকট্য তার প্রভাবকে অবধারিত করে তোলে। আহা, বিশ্ব যখন একটা গ্লোবাল ভিলেজের রূপ নাকি লাভ করতে যাচ্ছে বা তার পরিকল্পনা চলছে বলা হচ্ছে বিশ্বরাজনীতি বা অর্থনীতির বিগ্ ব্রাদারদের দ্বারা, তখন এই মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টার-

স্কেচ : হাশেম খান

অ্যাকশন কেবল অবধারিত কেন, বিচিত্রের মহালীলার মালঞ্চে আমার অবস্থান তখন অর্ধস্ফুট হলেও সুন্দর একটি গোলাপ হতে পারে। সত্যি বলতে কী, ফুলের মধ্যে এই গোলাপই বিদেশ থেকে এসেছিল, কত কীই না এসেছিল ইতিহাসের পথ বেয়ে। সাহিত্যের ধারা, রীতি, স্টাইল, ফর্ম আসবে বাইরে থেকে এতে বিস্ময় বা বিপত্তির কী আছে ? দ্বিতীয়ত, আমাদের যদি না থাকে, আনতেই হবে। উনিশ শতকে আমাদের বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার প্রেরণা কি গদ্যে কি পদ্যে পাশ্চাত্য থেকে এসেছিল। কাব্যে নাটকে মাইকেলের প্রায় যা-কিছু নতুন প্রবর্তনা বাংলায় তার রীতি বৈদেশিক। বঙ্কিমের উপন্যাসও তাই। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার উন্মেষ অন্যভাবে হতে পারত কিনা বা হলে কেমন হতো তার তর্ক অমীমাংসিত আছে। সেই জটিলতায় প্রবেশ এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। কবিতার জটিলতায় প্রবেশেরও আমাদের এখানে দরকার নেই। কিন্তু তার মধ্যে বাংলা কথাসাহিত্যের আপন স্বরূপের ধারা তার জীবনধর্মে ও গদ্যপ্রকরণে বিকশিত হয়ে চলেছে, তার মধ্যে যদি কোনো বিশিষ্ট বৈদেশিক অনুকরণ আপন ধারাটাকে নষ্ট করে, তার কেবল সাহিত্যতাত্ত্বিক নয়, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা দরকার।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কথাসাহিত্যিক প্রয়াস কি তাই করেছে ? যদি করে থাকে, তার তো তাহলে সেই শক্তি ছিল ? এই জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ধারার আপন বেগ যখন স্থবির বা দুর্বল হয় তখনি পরকীয় আবেগের আঘাত তার গায়ে লাগে, লেগে তার ক্ষতি করে। সেই স্থবিরতাকে ভাঙার জন্যেও তো পরকীয় প্রভাবাশ্রিত নিরীক্ষার দরকার হতে পারে ? অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু, যে যাই মনে করুন, কথাসাহিত্য সেই শিল্প নয় যা পাঠকের ভালো লাগবে না অথচ তাকে সেই ভালো না লাগাকে আবৃত করে রাখতে হবে।

যতদূর বোঝা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ কিছুতে পথ কাটতে পারছিলেন না তিনি কী করবেন। কারো অভ্যন্তরে শিল্প গুমরে মরে, কারো মুক্তধারার মতো ভেঙে বের হয়। তাঁর হয়েছিল প্রথমটা। তিনি ছোট থেকে মানুষকে ও জগৎকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মেশেন নি, জগৎসংসারকে আলিঙ্গন করেন নি। উন্নত জীবনদৃষ্টিও তাঁর ছিল। নিম্নকোটির মানুষকে ভালোও বেসেছিলেন। কিন্তু তবু শিল্পের স্বাধীন পথ নির্মাণ করতে পারেন নি। এই তাঁর শিল্পীর ট্রাজেডি।

কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে কলকাতা যখন যান চল্লিশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে, সাহিত্যের দিগন্ত তাঁর সামনে খুলে যায়। তাঁর অন্তর্মুখী মনের মধ্যে যে মন্ময় বা সাবজেকটিভ গুঞ্জরণগুলি ছিল তা, লক্ষণীয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোগহনের বিকলনগুলো তো বটেই, কিন্তু সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জঞ্জাল সময়ে মানিক দলিত জনমানুষকে নিয়ে যে ভিন্নতর লেখা শুরু করেছিলেন সে জিনিসটিও তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। এ জিনিসটাকে আমরা তাঁর একটা বড় ব্যাপার বলে মনে করতে পারি, কিন্তু তা নাও হতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোগহনের দর্শনকে দলিতের প্রকট জীবনের সমস্যার সঙ্গে আর মেলাতে পারেন নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ পেরেছেন এই আমাদের ধারণা। কেমন করে পারবেন ? কোন্‌ দিক থেকে পারবেন? তাঁর ভাষার আমরা যতই প্রশংসা করি না কেন, আমিই করেছি, ওদিক থেকেও মেলাতে পারেন নি।

তাঁর শিল্পঘটিত ট্রাজেডির কথা বলছিলাম। কলকাতায় গিয়ে সাহিত্যের দিগন্ত সেই প্রথম বয়সে যখন খুলে যাচ্ছিল, শিল্পের নিজের স্বাধীন পথ নির্মাণের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারেন নি। চেষ্টাটা কী রকম একটু দেখি। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত প্রথম গল্পসঙ্কলনটাই তাঁর একটা চেষ্টা ছিল।

সেই প্রথম জীবনে মুসলমানরা যে পিছিয়ে আছেন এটা তাঁর খুব ভাবনার বিষয় ছিল। সেই কালে মুসলমানদের আলাদা রাজনীতির ধারা যেমন রূপলাভ করেছে, মুসলমানদের আলাদা

> সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর বৈদেশিক প্রভাবের ব্যাপারটাকে অনেকে গুরুত্ব দিতে চান না। প্রতিবাদও করেন না, কিন্তু কথা উঠলে আনমনা হয়ে যান। এর দুই কারণই একেবারে স্থূল প্রকৃতির। ক্রমে ক্রমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ আমাদের সাহিত্যে এমন বড় আসন পেয়েছেন যে ওতে ঘা লাগলে তাঁর অনুরাগীরা তাঁদের গায়ে ঘা লাগল বলে মনে করেন। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে অনুকরণ কেন খারাপ এই জিনিসটাই বহুতর পাঠক বুঝতে পারেন না।

ধাঁচের সাহিত্যের কথা ভেবেছেন। বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছেন 'আই ওয়ান্ট টু রাইট' মুসলমান সমাজ নিয়ে— আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সেদিক পানে। এও একরকম 'প্যাশন' থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই একটা চূড়ান্ত অবস্থা, এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত (?) করতে চাই।.... পশ্চিম-জগৎ আজ যতখানি এগিয়েছে ততখানি এগুতে আমাদের ঢের দেরি। ব্যক্তিগতভাবে আমি হয়তো ততখানি এগিয়ে যাবো, বা ছাড়িয়ে যাবো, কিন্তু আমার লেখা পিছিয়ে রাখবো তাদের জন্যে যারা পিছিয়ে আছে। তাতে আমার ক্ষোভ নেই।'

লিখেছেন : 'আমরা মুসলমান। হয়তো-বা কয়েকঘর আমরা শহরে বাস করি এবং আমাদের বাড়ি শহরে। তাছাড়া যে বিরাট সমাজসভ্যতার জঞ্জাল, সে-সমাজের পক্ষে অতি আধুনিকতম সাহিত্যের তেমন প্রয়োজন রয়েছে কী ? এবং সে-সাহিত্য যদি ব্যর্থ হয় তবে সে ব্যর্থতা হবে সেই রকম— ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা ছেড়ে কিছুরও মধ্যস্থতা না নিয়ে একলাফে সুররিয়ালিজম শুরু করার যে-ব্যর্থতা।'

তাঁর মোটামুটি পূর্ণ শিল্পচেতনালোক তখনো তৈরি হয়নি বোঝা যায়। তবু, মনে হয়, তাঁর এই কথাগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার দরকার থাকতে পারে। এইমতো সাহিত্যচর্চা তিনি পরে করেন নি এ-কথা ঠিক; আবার ভেবে দেখতে গেলে সম্পূর্ণ ঠিক নাও হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো পশ্চিমের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যাবেন কিন্তু পিছিয়ে থাকা স্বসম্প্রদায় মুসলমানদের জন্যে নিজের লেখা পিছিয়ে পর্যন্ত রাখবেন, সেটা কলঙ্কজনক হতে পারে, তবু তাই করবেন, এ-কথা বলেছেন বটে, স্বদেশী শিল্পবাদ দিয়ে একলাফে সুররিয়ালিজম শুরু করাকে তিনি ব্যর্থতা বলেছেন বটে, কিন্তু ক্রমে-ক্রমে এ প্যাশনের তাঁর ব্যাপক পরিবর্তন হলেও পূর্ববাংলার মুসলমানের জীবনচিত্র তাঁর নাতিপ্রচুর লেখায় তিনি ধারণ করেছেন। মুসলমানের ধর্মকে মোটেই প্রশ্রয় দেন নি, বরং তাকে নিয়ে সামান্য সামান্য ব্যঙ্গ-রসিকতাও করেছেন, কিন্তু সেই জীবনকে নিবিড় করে দেখানোর প্রয়াস করেছেন শিল্পকে ফাঁকি না দিয়ে।

তিনি পথ খুঁজছিলেন বোঝা যায়। কিন্তু সবাই সব কাজ করতে পারেন না এই কথাটা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন থেকে ভালো করে জানা যায়। কিন্তু সব কাজ পারেন না বলে কিছুই পারেন না এ-কথাও যে কত বেঠিক তাও আমরা তাঁর জীবন থেকে পাই। আসল কথাটাও তাঁর নিজের সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা এই রকম : 'সাহিত্যিক হতে হবে বলে লেখা— সে আমি ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা! আপনা থেকে যা বেরুবে তাই

খাঁটি– লেখকের পক্ষ থেকে বিচার করলে (পাঠকের কাছে বিচার পরে, তার জন্যে শেষোক্ত লেখকের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন রয়েছে মনে করি না)।'

এখানে লেখক-পাঠক সম্পর্কের কথা বলেছেন। বলেছেন, যে ধরনের লেখককে তিনি আদর্শ মনে করেন তিনি পাঠকের মুখ চেয়ে লেখেন না। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাঠকের জন্যে লেখেন নি, বোদ্ধা পাঠকের জন্যে এবং প্রধানত লেখকদের জন্যেই লিখেছেন। কিন্তু তিনি স্বতঃস্ফূর্ত লেখক নন। অথচ বলেছেন, 'আপনা থেকে যা বেরুবে তাই খাঁটি। তাঁর লেখা প্রাণের উৎস থেকে বেরোয় নি।' তাঁর লেখা বুদ্ধিবৃত্তিক, বুদ্ধিবাদী, যাকে বলি মননশীল। তাতে যথেষ্ট পরিশীলন আছে। গোছানো, সাজানো। এমন লেখায় রস থাকে না, তা হৃদয়বেদ্য হয় না। তিনি সে লেখকই নন, লেখকের আদর্শ তিনি যাই বাতলে থাকুন না কেন। নিজের পথ কাটতে কাটতে তিনি এই জায়গায় পৌঁছেছিলেন। আধুনিকের এই তো আদর্শ, কেউ তা বলতে পারেন। কিন্তু আধুনিকতার বিতর্কে প্রবেশ না করে যে কথা বলব, মুসলমান অর্থাৎ অতি সাধারণ, পিছিয়ে-পড়া পাঠকের জন্যে লেখার স্বার্থে যে সুররিয়ালিজমকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তাকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন একনিষ্ঠভাবে। এই তাঁর পরিচয়। এর শিক্ষা তাঁর শুরু হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবিমিশ্র সুররিয়ালিস্ট ছিলেন না, তাঁর অকৃত্রিম দেশজ অঙ্গীকার ছিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উষর বন্ধুর পথে সেই কৃত্রিম বৈদেশি দেশে গিয়েছিলেন সুররিয়ালিজমকে আলিঙ্গন করবেন বলে। সেই জন্যে বলেছি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র রচনায় বৈদেশিক প্রভাব বা প্রেরণার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ওকে উপেক্ষা করা যায় না। সে প্রভাব এত ব্যাপক যে অনুকরণ বলা যায়। আমার স্বল্পঅধ্যয়ন দিয়ে আমি বলতে পারি নি প্রথম উপন্যাস 'লাল সালু'তে বৈদেশিক প্রভাব আছে কিনা বা কেমন আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব এতে বোঝা যায়। তবে সাধারণ ধাঁচ যে বৈদেশিক তা সব সময় মনে হয়। কিন্তু 'চাঁদের অমবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে বৈদেশিক প্রভাব ও অনুকরণ তাঁর প্রধান মেজাজ।

আমাদের কথাসাহিত্যে তাঁর অবস্থান কোথায়?

এ অধ্যায়টি হয়তো আলাদা করে লেখার দরকার ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে বৈদেশিক প্রভাব বা প্রেরণায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কথাসাহিত্যের যে ধারাটি আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যে আনলেন এর ফল কেমন হয়েছে ? (শক্তিশালী লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র হাত দিয়ে এক একটা

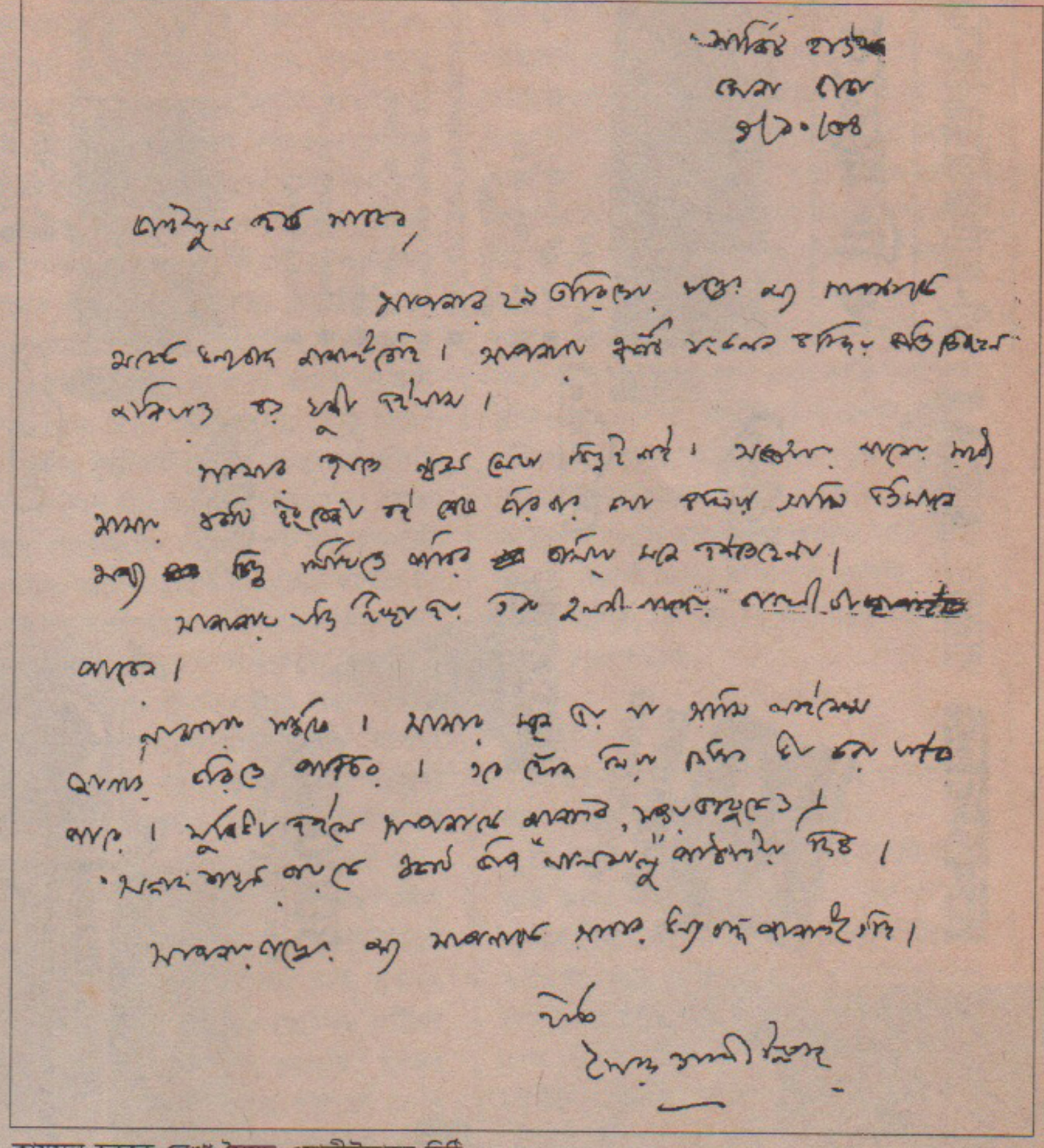

কায়সুল হককে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র চিঠি

ধারাই প্রবাহিত হয়েছে একথা স্বীকার না করে বোধ হয় উপায় নেই। আমারই হয়তো অন্যরকম মনে হতো, মনে হতো এ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ও শেষ একটা ধারা। এ যে প্রবহমান স্বতন্ত্র ধারা তা হয়তো দেখাব পরে।) কিন্তু ও প্রশ্নের উত্তর সহজ না হতে পারে। আমার নিজের যা ধ্যান–ধারণা বা বিশ্বাস তাতে একটা উত্তর আমি এক মুহূর্তে স্পষ্ট দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা চাই না। হয়তো ওইভাবে উত্তর দেয়া উচিত নয়। তুলনামূলক সমীক্ষাকে এই ধরনের মূল্যায়নের পক্ষে একটা উপযুক্ত পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের কথাসাহিত্যের যে মূলধারা তা কি যথেষ্ট সচলা আছে ? না থাকলে তুলনাবিচার হবে কেমন করে? তাহলে তো মামলা গোড়াতেই ডিসমিস হয়ে যাচ্ছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ওই কথাই বলছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-অনুগামী গৌণ ধারার লেখকরা। তাঁরা বলছেন প্রচলিত ধারার কাল আর নেই। নেই বলেই যাকে গৌণ বলছি তা মুখ্য হয়েছে। তাহলে মাপকাঠি কী ? মাপকাঠি আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তথাকথিত মুখ্য আর গৌণ ধারার মাপকাঠিও এক নয়। এবং বাঁধাধরা মাপকাঠিও হয় না। ভালো নিষ্পত্তি হচ্ছে সময় পার হতে দেয়া।

এমনিতে সময় অনেক বদলেছে, দ্রুত বদলাচ্ছে। উপন্যাস, ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ চেহারা কী দাঁড়াবে কে জানে ইলেকট্রনিকসের নব-নব উদ্ভাবনের কারণে। প্রাণীদেহের ক্লোনিঙের মতো উপন্যাস, ছোটগল্পের ক্লোনিং হবে ? প্রায়োগিক শিল্প নাটকের সঙ্গে মিলিত একটা কোনো রূপ কি হয়ে যাবে এইসবের ? অলস দুপুরবেলা ঘরের কাজ সেরে বালিশে মাথা রেখে উপন্যাস না খুলে গৃহনারী রিমোট টিপে ইন্টারনেট-সংযুক্ত ওয়াল-টেলিভিশনে অভিনব কোনো কাহিনী-অধ্যয়ন-ক্ষুধা কি মেটাবেন ? কিন্তু মনে হয় লেখ্য ভাষা কখনো বিদায় নেবে না, শ্রাব্য বা কথ্য তো নেবেই না, অন্তত সংলাপে সে থাকবে। কিন্তু, বলুন, সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তবের সঙ্গে সেই আধুনিক বাস্তবের কী সম্পর্ক ? সুররিয়ালিজমের ভাষা তো অংক নয়। বরং অঙ্কের সে বিরোধী। সুররিয়ালিজমের যে প্রধান উপাদান হতাশা,আত্মকণ্ডয়ন, অন্তর্মুখিতা,

বিবিক্ত বেদনা তা খুবই পুরাতন। কাজেই তাকে আধুনিক বলে যাঁরা দ্বন্দ্ব টানেন তাঁরা ঠিক করেন না। রহস্য আর কল্পনার দ্বারা বাস্তবের গভীর বা যে-কোনো-মাত্রিক অনুমান এও বরং চিরায়ত জিনিস। আমাদের সাহিত্যে এ প্রাচীন কাল থেকে, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ছিল, আবেস্তা হিব্রু আরবি ফারসি সাহিত্যে ছিল, আজকের আমাদের বাউল গানে এ আছে। এই বাউল ভাব ও ভাষা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসগুলোতে খুবই আছে। আমাদের সমস্যা অন্যখানে।

আমাদের কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ও তাঁর ধারার অবস্থান এখন কোথায় ? তিনি তাহলে স্বতন্ত্র একটা ধারার প্রবর্তন করে দিয়ে গেছেন যা এখনো চলছে ? হ্যাঁ, সে-রকম একটা ধারা অবশ্যই চলছে, একটা স্বতন্ত্র ধারারূপেই চলছে। হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এ ধারাটাকে পুষ্ট করেছেন। প্রকৃত পুষ্ট করার শক্তি এই দুই শিল্পীর ছিল। মনে হয় ১৯৪৭ পরবর্তী সাহিত্যের নবজীবনে এঁরা নতুন পথ খুঁজছিলেন, পশ্চিমের ডাক এসে কানে বাজছিল নবনিরীক্ষার। প্রচলিত ধারায় তাঁদের হাঁইও উঠছিল। অগ্রণী পেলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে। এঁরা এইধারাকে অগ্রসর করেছেন। তাই সাধারণত হয়ে থাকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক প্রভাবের যে কৃত্রিমতা ছিল এঁদের মধ্যে তা সেইভাবে নেই, যদিও এঁরাও এই অর্থে পরকীয় যে, আমাদের কথাসাহিত্যের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রক্ষিপ্ত। আমাদের অবক্ষয়প্রাপ্ত হতাশ সমাজজীবনই এখন পারক্য, এলিয়েনেশন-কবলিত। সেই পরিপ্রেক্ষিত এঁদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় কতটা ক্রিয়াশীল বা কতটা আরোপিত সেটা ভালোভাবে পরীক্ষার বিষয়।

আমি সম্প্রতি অন্যত্র বোঝার সুবিধার জন্যে, আমাদের আজকের কথাসাহিত্যকে তিনটি সূক্ষ্ম নয়, স্থূল ভাগে ভাগ করেছি : প্রথমটি হালকা-সরল অতি জনপ্রিয় ভাগ; দ্বিতীয়টি সেই মূলধারা যা প্রচলিত কিন্তু পরিণত, তারও অবশ্যই পরিবর্তন বা বিবর্তন আছে; তৃতীয়টি এই পাশ্চাত্য অনুপ্রাণিত পরকীয় ধারা, এটাকে যদি কেউ শীর্ষ ধারা এবং দ্বিতীয় ভাগ্যকে মধ্য-ধারা বলে খুশি হন তা বলতে পারেন। তবে তৃতীয় ভাগের 'পরকীয়' বিশেষণটির তাৎপর্য যেমন ব্যাপক, দ্বিতীয় ভাগের ধারাটিকেও তেমনি বদ্ধ অবরুদ্ধ ধরে নিয়ে কেউ যেন ভুল না করেন, বরং চারদিকে এর পথগুলি খোলা আছে, পথিকেরা চলতে চলতে পথগুলিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা সে অন্য কথা, বরং বদ্ধ আসলে তৃতীয় তথা শীর্ষ ভাগটি। বিষয়, বক্তব্য বা ভাবনা দিয়ে মোটেই নয় এই বিভাজন। বরং দ্বিতীয় ভাগটিতে নিরীক্ষার সুযোগ অবারিত।

যাই হোক, যে তৃতীয় ভাগের কথা আমি এখানে বলছি, তার সমকালীন পথটি কেটেছেন যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তিনি বলেছেন, পাঠকভোগ্য হওয়াটা তাঁদের মোটেই অন্বিষ্ট নয়, নিজের মনের আনন্দে তাঁরা লেখেন। সেদিক থেকে এঁদের পাঠক কম। ওষুধ মানুষ কম খায় কিন্তু খাবার কম খাবে কেন ? আমরা বিচার কীভাবে করব ? কিংবা বিচার নাই বা করলাম। আমাদের কথাসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অবস্থান আমরা বুঝতে পেরেছি। উত্তরসূরিরা একে বেগবান করতে পেরেছেন আমার তা মনে হয় না, বেগ এঁদের অন্বিষ্টও নয়, কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সুররিয়ালিজমের মধ্যেও নিম্নবর্গের বিস্তৃত সাধারণ জীবনকে যে মাধ্যমরূপে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন তাঁর প্রাগুক্ত দুই অনুগামী তার আরো ভালো ব্যবহার বা প্রয়োগ করেছেন। এমনকি পরাবাস্তববাদের নিরীক্ষায় মার্কস্‌বাদের প্রয়োগ তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে করেছেন বলে দাবি করা হয়। অবশ্য মার্কস্‌বাদের পরাবাস্তবিক প্রয়োগের প্রেরণাও পাশ্চাত্য থেকে পাওয়া গেছে। বদ্ধ হোক বা স্ফূর্তিময় হোক, পরকীয় তৃতীয় ভাগটির প্রভাব নবীন বা উদীয়মান কথাসাহিত্যিক ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। এই প্রভাব প্রথমেই দেখা যায় তাঁদের ভাষাশৈলীর মধ্যে। নবীন কবিরা যেমন প্রথম ভাষা দিয়েই শুরু করেন কবিতা, অনেকটা সেই রকম। সম্প্রতি কিছু নবীন লেখকের ছোটগল্প পরীক্ষা করতে গিয়ে, এই জিনিসটা দেখেছি। হাসান আজিজুল হক, তার চেয়ে হয়তো বেশি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষাভঙ্গির মোহন জটিলতা থেকে তাঁরা কিছুতে মুক্ত করে তাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারছেন না। গল্প যতই

বাঙালির যেমন বাঙালি না হয়ে উপায় নেই, আধুনিক কালের ছেলেমেয়েদের আধুনিক না হয়ে কী উপায় আছে ? আমি আধুনিক না উত্তর-আধুনিক সে আমি কেমন করে বুঝব ? সমালোচকরা বা ঐতিহাসিকরা ওইসব ঘাঁটবেন। সমস্ত জীবন কাটিয়ে এসে এখন আমি চারদিকে তাকিয়ে যা বুঝেছি, আমার মধ্যে একটা তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে, ক'রে ভালো গল্প, উপন্যাস লেখার চেষ্টা করতে হবে।

কম থাক, গল্প বা ঘটনার কাঠামোটাকে মোটামুটি ঠিক করে নিতে হবে। এই ছেলেমেয়েরা হয়তো ভাবছেন, খুব আধুনিক (বা উত্তর-আধুনিক) কাণ্ড তাঁরা করছেন বা করতে শিখছেন। আসলে ওই আধুনিক-টাধুনিক ব্যাপারগুলো কিছু নয়। বাঙালির যেমন বাঙালি না হয়ে উপায় নেই, আধুনিক কালের ছেলেমেয়েদের আধুনিক না হয়ে কী উপায় আছে ? আমি আধুনিক না উত্তর-আধুনিক সে আমি কেমন করে বুঝব ? সমালোচকরা বা ঐতিহাসিকরা ওইসব ঘাঁটবেন। সমস্ত জীবন কাটিয়ে এসে এখন আমি চারদিকে তাকিয়ে যা বুঝেছি, আমার মধ্যে একটা তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে, ক'রে ভালো গল্প, উপন্যাস লেখার চেষ্টা করতে হবে। নিজেকে কোথাও আটকে না ফেলে আজ থেকে অনেক আগে পর্যন্ত অনেক পড়তে হবে। আমি তো দেখছি, লেখা ভালো হলেই, তা সে যে ঘরানারই হোক না কেন, কদর পাচ্ছে।

ভাষা

ভাষার কথা উল্লেখ করেছি, তাই এ সম্পর্কে সামান্য হলেও কিছু বলতে হয়।

যে ভালো, গল্প-উপন্যাসের কথা বলেছি, ভাষা তার জন্যে একটা বড় ব্যাপার। বড় ব্যাপার বলতে কিন্তু এই নয় যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো বা হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো অতি বিশিষ্ট কোনো ভাষা হতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই, ওঁদের ভাষা খুব বিশিষ্ট। 'বিশিষ্ট' শব্দটা এখানে খেয়াল করা দরকার। বিশিষ্ট কত ভালো কেমন ভালো কখন ভালো তাই দিয়ে তর্ক করবেন সেই সমালোচকরা। আমি লেখক, আমার মায়ের প্রস্তুত প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড ভাষা রয়েছে, তাই দিয়ে আমি লিখতে লেগে যাব। ভাষার বৈশিষ্ট্য যদি গড়তে চাই গড়ব, বা কখন সেই তাগিদের ভেতর থেকে ভাষার সে বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠছে হয়তো টেরও পাব না। গল্পে, উপন্যাসে বৈশিষ্ট্য কেবল ভাষা দিয়ে হয় না, বরং আরো কার্যকর, আরো মহৎ উপাদানগুলি আছে গল্পের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নির্মাণের। তবে ভাষা উপেক্ষণীয় উপাদান নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষা একটা বড়, হয়তো সবার বড় বৈশিষ্ট্যের উপাদান। আবার এ-কথাও বলতে হবে, মায়ের সেই প্রস্তুত প্রচলিত ভাষা থাকলেও শিল্পে স্বতঃস্ফূর্তের যুগ আর নেই। আসলে কালিদাসের কালেও ছিল না। 'রস' স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে, কিন্তু ভাষার শিল্পের প্রতিমাকে কালিদাসরাও নির্মাণ করতেন। কেবল রাজার শৌর্যকে নির্মাণ করতেন না, প্রকৃতি থেকে পাওয়া আশ্রম-কন্যার বল্কল-বাস আর ফুলের সাজকেও নির্মাণ করতেন বাণী-প্রতিমা দিয়ে।

আমরা জানি বিশ্বের সকল
জাতি স্বীয় ঐতিহ্যের স্বরূপ
খুঁজে পেয়েছে আন্তর্জাতিক
দৃষ্টিভঙ্গির অমেয় মিলনে।
আমাদের ঋদ্ধ ঐতিহ্যের ধারা
নিয়ে এই মিলন মোহনায়
আমরাও হতে চাই সঙ্গী।
বিশ্বমানবসংস্কৃতিতে জাতি
হিসেবে আমরাও রাখতে চাই
আমাদের বিনীত অবদান, আর
তারই বাহন আমাদের
'শৈলী'।
আমরা বহন করছি হাজার
বছরের উন্নত সভ্যতা, সংস্কৃতি
ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার।
এ লক্ষ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে :
শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য,
বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভ্রমণ, খেলা
ও সুস্থ বিনোদনে সমৃদ্ধ একটি
রুচিশীল স্বতন্ত্র মেজাজের
রঙিন পাক্ষিক

শৈলী

আধুনিক পাঠকের নান্দনিক পত্রিকা

দেশে ও বিদেশে
শৈলীর গ্রাহক-চাঁদার হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	২৩৫০ টাকা বা ৬০ ডলার	১২৫০ টাকা বা ৩২ ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেট বৃটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কেনিয়া	১৯৮০ টাকা বা ৫২ ডলার	১০৬০ টাকা বা ২৮ ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদিআরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর	১৬৩০ টাকা বা ৪৩ ডলার	৮৬৫ টাকা বা ২৩ ডলার
ভারত, ভুটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১১১৫ টাকা বা ৩০ ডলার	৫৯০ টাকা বা ১৭ ডলার
বাংলাদেশ (রেজিস্টার্ড ডাকে)	৩৬০ টাকা	১৮০ টাকা
একই ঠিকানায় (শুধুমাত্র বাংলাদেশে) কমপক্ষে দশজন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ ছাড়। প্রত্যেকের জন্য প্রদেয়	২৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

☐ বছরের যে-কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

☐ গ্রাহক-চাঁদার হার শৈলীর দপ্তরে এসে নগদে পরিশোধ করা যাবে। অথবা শৈলী-র অনুকূলে ঢাকার যে-কোন ব্যাংকের ওপর ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

শৈলী

সার্কুলেশন ম্যানেজার
শৈলী, রহমান ম্যানশন (৪র্থ তলা),
১৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০,
ফোন : ৯৫৬৪৬৩৫, ৯৫৬৪৬৩৮,৯৫৬৪৬৩৯, ৯৫৬৮৬০৩
ফ্যাক্স : ৯৫৬৪৬৩৭
E-mail : bexml@enigma.kaifnet.com

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষার প্রথম পরিচয়, আমার মনে হয়, তাঁর ভাষাকে তিনি 'নির্মাণ' করেছিলেন খুব যত্নে আর প্রয়াসে, তাঁর যে এক কথায় সুররিয়ালিজমের নিরীক্ষা তার উপযুক্ত করে এ নির্মাণ তিনি করতে চেয়েছিলেন। উপযুক্ত হয়েছে কিনা তা বিস্তৃত পরীক্ষার সাপেক্ষ। তাঁর তিন উপন্যাসের যে নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ অফুরন্ত বিবরণগুলি তা নিস্পৃহ হলেও নিরলঙ্কার নয়, প্রসাদবর্জিত তো নয়ই। কিন্তু এও আশ্চর্য কাণ্ড, কোনো নিরভিমান অন্ধকার বা অন্তরীক্ষ থেকে কোনো সাধক অতিথি কিংবা চির-অতিথি ওই বর্ণনার পাতাগুলি গাছভর্তি, গাছের পর গাছ ফুটিয়ে ফুটিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু থামছেন না। মনে হয়, থামছেন না থামলেই শেষ হয়ে যাবে সেই বিষাদে কি ভয়ে।

আলোচনা করতে গিয়ে সব ভাষার সব বিবরণের ছেঁড়াখোঁড়া করতে হয় না। তাতে কোনো লাভ নেই। আস্বাদ্য হলে আস্বাদ করাই ভালো। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ভাষার ও বর্ণনার আস্বাদ-গুণ বর্ণনাগুলির মতোই বেশ অশেষ। হঠাৎ বই খুলে 'কাঁদো নদী কাঁদো' থেকে একটা বর্ণনার মাঝখান থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিই :

বটগাছের আশ্রয় ত্যাগ করবে এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পায়। কখন তারই অজান্তে সে পুকুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো, যেন ওপাশে বাড়িঘরের দিকে তাকাবার সাহস নেই। এবার সভয়ে ওপাশে তাকালে প্রথমে অন্ধকারের মধ্যে শূন্য মাঠে আলেয়ার মত কিছু দেখতে পায়, তারপর মানুষের মূর্তির মত অস্পষ্ট কী একটা ছায়াও নজরে পড়ে। ততক্ষণে আকাশটা কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠে থাকবে, কারণ আকাশের মধ্যখানে কতকগুলি ঝকমকে তারা দেখা দিয়েছে যেন। তবে নীরবতা মাত্রাতিরিক্তভাবে গভীর হয়ে উঠেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা সে নীরবতার মধ্যে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শূন্য মাঠে আলেয়ার দিকে, মানুষের মূর্তির মত ছায়াটির দিকে। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে; আলেয়াটি এবং ছায়াটি নিশ্চল। তারপর এক সময়ে সে বুঝতে পারে সামনে কোন শূন্য মাঠ নেই। এবার কালু মিঞার বাহির-ঘর, পশ্চাতে মস্ত আটচালা বাড়ি– সে-সব সহসা অতি নিকটেই মনে হয়। আলেয়াটি আলেয়াও নয়, কুপি মাত্র, এবং কুপিটি ধরে একটি লোক দাঁড়িয়ে।

শীঘ্র কুপির আলো নড়ে ওঠে, মানুষটিও আর নিশ্চল থাকে না। সে যেন বটগাছের দিকেই আসছে। লোকটি আরেকটু এগিয়ে এলে বাহির-ঘরের আলোয় প্রথমে তার দেহের মধ্যদেশ, তারপর সমস্ত দেহ নির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে। সে কী বাহির-ঘরের খোলা দরজার কাছে এসে

যে পাঠক গল্প চান তাঁর তো হাঁই উঠবেই। কিন্তু তাঁদের জন্যে এ নিরীক্ষা নয় সে-কথা বলা বাহুল্য। লেখকের এ আপন মনের ক্ষুধা। পাঠকের মনের ক্ষুধা মেটাবার দায়িত্ব তিনি নেন নি। কিন্তু লেখকের নিজের মনের ক্ষুধাও মেটে না। বরং মিটলেই গল্পের মৃত্যু। যে জিনিসটা আমরা করি, একে নিরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু মূল্য দিই, সেটা ঠিক নয়। নিরীক্ষার অতিরিক্ত মূল্য যদি দিই এর মূল্য নষ্ট হয়।

দাঁড়িয়েছে? নিঃসন্দেহে বাহির-ঘরটি নির্জন হয়।

লোকটি কিন্তু সে-ঘরে ঢোকে না, ঘরের ভেতরে কোন লোক থাকলে তার সঙ্গেও কথা বলে না; গভীর নীরবতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে এবার মুহাম্মদ মুস্তফা চমকে ওঠে, কারণ সে বুঝতে পারে বাহির-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটি তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাহলে লোকটি তাকে দেখতে পেয়েছে। চাঁদশূন্য রাত হলেও তাকে দেখতে পাওয়া শক্ত নয়। দূরত্বটা মন্দ নয়, কিন্তু ভিজে একাকার হলেও মুহাম্মদ মুস্তফার পরণে সাদা কোর্তা, লুঙিটাও হাল্কা রঙের। বটগাছের তলে তাকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি বিস্মিত হয়ে থাকবে। ঝড়বাদলে পথিকের পক্ষে গাছের তলায় আশ্রয় নেয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এখন ঝড় নেই, বৃষ্টিও থেমে গিয়েছে। তাকে চোর-ডাকাত বলে কেউ ভুল করবে তাও সম্ভব নয়; এমন সাদা ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে চোর-ডাকাত চুরি-চামারি বা ডাকাতি করতে বের হয় না। হয়তো সে-জন্যে লোকটি কেবল বিস্মিতই হয়েছে, ভয় পায়নি।

লোকটি আবার হাঁটতে শুরু করে, ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে, তবু নিশ্চিত পদে। সে কী এবার তার দিকেই আসছে? তাই মনে হয়। সে ধরা পড়ে গিয়েছে, পালাতে চাইলেও পালানো সম্ভব নয়, পা-দুটিও যেন গাছের গুড়ির মত অনড় হয়ে পড়েছে। এবার মুহাম্মদ মুস্তফার মনে নিদারুণ ভয় জেগে উঠে তাকে প্রায় অসাড় করে ফেলে, হৃৎপিণ্ড প্রচণ্ড আওয়াজে ধক্‌ধক্‌ করে বুকের মধ্যে বাড়ি খেতে থাকে, গলার ভেতরটা রোদে ঝল্‌সানো জ্যৈষ্ঠ-মাসের জমির মত শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করে, এবং সচল মূর্তিটির দিকে একাগ্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বলে মূর্তিটি তার চোখের সঙ্গে যেন খেলা করে; কখনো তা দেখতে পায় কখনো পায় না। তারপর একবার মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে অদৃশ্য থাকে, এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মুহাম্মদ মুস্তফার ভীতবিহ্বল মস্তিষ্ক অবশেষে বুঝতে পারে কুপিটাও অন্ধকারের মধ্যে সহসা মিশে গিয়েছে। তবে লোকটি বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছে কী?

মুহাম্মদ মুস্তফার সমগ্র দেহ টানা-ধনুকের মত শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছিলো, হঠাৎ এবার শিথিল হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে পা-দুটিতে অপরিসীম দুর্বলতা দেখা দেয়। তবে সে মনে মনে বলে, আর বিলম্ব নয়, এবার পথ ধরা উচিত। সে বিলম্বও করে না। কেবল পা বাড়িয়েছে কী অমনি আবার একটি আওয়াজ শুনতে পেলে দ্বিতীয়বার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে দেখতে পায় কালু মিঞার বাহির-ঘরের পাশে কুপি নিয়ে নয়, লণ্ঠন নিয়ে কে দাঁড়িয়ে, পাশে আরেকটি লোক। হয়তো দ্বিতীয় লোকটি আগের লোকই, কেবল তার হাতে এখন কুপিটি নেই। লোক দুটি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে তাদের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত এমনি কাটে, যেন কিছু ঘটবে না। তবে মুহাম্মদ মুস্তফা এবার অপেক্ষাকৃতভাবে শান্ত বোধ করে; তার মনের ভয় যেন কিছু কমেছে, যেন অদূরে লোক দুটি বা তাদের পেছনে গভীর অন্ধকারে-ঢাকা কালু মিঞার বাড়িঘর তাকে আর ভীত করে না।

তারপর একটি বিকট কণ্ঠ রাত্রির নীরবতাকে খণ্ডবিখণ্ড করে।

'বটতলায় কে?'

এই ঘটনার বা এই চরিত্রের আচরণের এই বিবরণ আরো ছিল আগে, পরে আরো আছে। এই হচ্ছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌। এর ভাষাভঙ্গির কারণে এ বিবরণ পড়তে ভালো লাগে, ভালো না লাগতেও পারে। যে পাঠক গল্প চান তাঁর তো হাঁই উঠবেই। কিন্তু তাঁদের জন্যে এ নিরীক্ষা নয় সে-কথা বলা বাহুল্য। লেখকের এ আপন মনের ক্ষুধা। পাঠকের মনের ক্ষুধা মেটাবার দায়িত্ব তিনি নেন নি। কিন্তু লেখকের নিজের মনের ক্ষুধাও মেটে না। বরং মিটলেই গল্পের মৃত্যু। যে জিনিসটা আমরা করি, একে নিরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু মূল্য দিই, সেটা ঠিক নয়। নিরীক্ষার অতিরিক্ত মূল্য যদি দিই এর মূল্য নষ্ট হয়।

আমি আগে মনে করেছিলাম, কেবল 'লাল সালু' উপন্যাসে, তার ভাষায় ও বিবরণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব আছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ও বিবরণের (এবং ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রগঠনেরও) প্রভাব তাঁর অন্য দুই উপন্যাসেও আছে। যে বর্ণনাটা উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে তা আছে। কিন্তু মানিকের মাত্রাবোধ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মধ্যে নেই। তাঁতে বৈদেশিকের যে প্রভাব তা কি তাঁর ভাষায় ও বর্ণনাতেও আছে? নিশ্চয় আছে। তবে ভালো করে তা পরীক্ষা করে দেখা হয় নি।

সফল অসফল উত্তরসাধকদের মধ্যে তাঁর ভাষা ও বিবরণের প্রভাব কেমন পড়েছে তা আগে সামান্য বলেছি। ●

সহায়িকা

১. *সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-রচনাবলী' ১, ঢাকা, ১৯৮৬।*
২. *বশীর আল্‌হেলাল- 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ : তাঁর প্রেরণার উৎস', 'তাঁদের সৃষ্টির পথ' গ্রন্থে সঙ্কলিত, ঢাকা ১৯৯৩।*

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আন্দালুসিয়া ভ্রমণ ও অস্তিত্ববাদী হিস্পানী ঔপন্যাসিক উনামুনো

সৈয়দ আবুল মকসুদ

১৯৭১-এ ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে মৃত্যু না হলে এবার ১৯৯৭-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ৭৫ বছরে পদার্পণ করতেন, এবং যদি সুস্থ থাকতেন এবং পরিকল্পনা-মতো কাজ করতে পারতেন তা হলে গত ২৬ বছরে তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হতো মূল্যবান সাহিত্যকর্ম। তবে ধারণা করা যায়, তিনি তাঁর স্বভাব-মতো ধীরগতিতেই লিখে যেতেন। বহুপ্রসূ ছিলেন না বলে হঠাৎ করে জীবনের শেষপর্যায়ে অজস্র রচনা তাঁর থেকে পাওয়া যেতো তা মনে করার কোনো কারণ নেই; কিন্তু অনুমিত হয়, তাঁর তিনটি উপন্যাসের সঙ্গে যোগ হতে পারতো আরো অন্তত তিন চারটি উপন্যাস, কিছু ছোটোগল্প, দু'চারটি নাটক এবং অন্যধরনের দু'একটি গ্রন্থ, হয়তো প্রবন্ধ-গ্রন্থও দু'একখানা। বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকদের অনেকেই ভ্রমণকাহিনী লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনেকে অল্পবিস্তর ভ্রমণ করেও লিখেছেন তার বিবরণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো ওয়ালীউল্লাহ্‌ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ভ্রমণ করেও কবির মতো অতোগুলো ভ্রমণ-গ্রন্থ প্রণয়ন তো দূরের কথা একটি নিবন্ধও লেখেন নি তিনি তাঁর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিলো যথেষ্ট, কিন্তু ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনার আগ্রহ ছিলো না। ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নী অ্যান-মারির থেকে অবগত হওয়া গেলো, ভ্রমণে ছিলো ওয়ালীউল্লাহ্‌র অশেষ আসক্তি। নিষ্প্রয়োজনে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে দেশদেশান্তর ঘুরে বেড়িয়ে তিনি অপার আনন্দ পেতেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা ব্যাপকভাবে বিশ্বভ্রমণ করেছেন, চাকরির প্রয়োজনে অথবা নিজের উদ্যোগে, ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁদের একজন, যিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে আন্দালুসিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন তাঁর অর্ধশতাব্দীরও কম জীবনকালে। চাকরির প্রয়োজনে তিনি অবস্থান করেছেন ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানী, বৃটেন এবং ফরাশি দেশে। স্বল্পকালীন সরকারি সফরে তাঁকে যেতে হয়েছে আরো বহু দেশে। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভ্রমণ ছিলো তাঁর নেশা। নানা দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অবস্থা গভীর আগ্রহ নিয়ে জানতে চেয়েছেন শুধু বইপত্র পাঠের মাধ্যমেই সে-সব দেশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সীমিত ছিলো না। তাঁর ব্যক্তিগত ভ্রমণের সকল কথা আমার জানা ছিলো না। গতবছর (১৯৯৬) মিসেস অ্যান-মারির সঙ্গে আলোচনাকালে সে-সব অবগত হলাম। ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভ্রমণসঙ্গী হিশেবে প্রায় সকল সময় তিনি থাকতেন। স্বামীর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অ্যান-মারি সেই আনন্দঘন দিনগুলোর কথা বললেন। বলতে বলতে কখনো খুশিতে তাঁর চোখ নেচে উঠলো, হেসে উঠলেন সামান্য উচ্চস্বরে; কখনো স্মৃতিবিদ্ধ হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে নীরব রইলেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা ব্যাপকভাবে বিশ্বভ্রমণ করেছেন, চাকরির প্রয়োজনে অথবা নিজের উদ্যোগে, ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁদের একজন, যিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে আন্দালুসিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন তাঁর অর্ধশতাব্দীরও কম জীবনকালে। চাকরির প্রয়োজনে তিনি অবস্থান করেছেন ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানী, বৃটেন এবং ফরাশি দেশে। স্বল্পকালীন সরকারি সফরে তাঁকে যেতে হয়েছে আরো বহু দেশে।

তিন দিন দীর্ঘ সময় ধরে অ্যান-মারি বলে গেলেন ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভ্রমণসংক্রান্ত ঘটনাগুলো। কবে কোন্‌ দেশের কোথায় গিয়েছিলেন তার

বিবরণ দিলেন। চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ট্রো এবং মার্টিন লুথার কিং-এর সঙ্গে কথা বলে ওয়ালীউল্লাহ্ খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। একদিন বললেন : আমরা তো অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু চীন ভ্রমণ করতে না পারার বেদনা ওয়ালীউল্লাহ্ একেবারে ভুলতে পারেন নি। আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে তিনি চীনে যেতেন। বহু পুরনো সভ্যতার দেশ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মাও ঝেদোঙ সৃষ্টি করেছেন আরেক ইতিহাস। আধুনিক চীন দেখার প্রবল বাসনা ছিলো তাঁর। দু'বার চীন ভ্রমণের উদ্যোগ নেন, কিন্তু দুবারই নানা কারণে ব্যর্থ হন। প্রথমবার জাকার্তায় পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত থাকা অবস্থায়। তখন শুধু চীনে নয়, তাঁর পরিকল্পনা ছিলো জাকার্তা থেকে ইউরোপ যাবেন, তবে বিমানে নয়। বেইজিং, মঙ্গোলিয়া, উলান-বাতোর হয়ে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান ট্রেনে ইউরোপ পৌঁছবেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার অনুমতি দিলো না। আমার ধারণা তখন পাকিস্তান-চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। (কিন্তু আমি তাঁকে জানালাম, তথ্যটি সঠিক নয়, কারণ চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক শুরু থেকেই ছিলো। ১৯৫০-এর দশকেও পাকিস্তানের অসরকারি প্রতিনিধি দল চীন ভ্রমণ করেছে। এ কথা শুনে অ্যান-মারি বললেন, তা হলে অন্য কোনো কারণে হবে।)

মিসেস ওয়ালীউল্লাহ্ আরো বললেন : সে-সময় অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্র উৎসাহ ছিলো অত্যন্ত তীব্র, যদিও মানুষটি ছিলেন অরাজনৈতিক। তবে তিনি মনে করতেন, তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোর আশা-ভরসার স্থল ওই দুটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। জনগণের দু'বেলা দুটি ভাতের ব্যবস্থা তো তারা করতে পেরেছে। কিন্তু এরমধ্যে যখন দু'দেশের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ দেখা দিলো, এবং তা খুব খারাপ আকার ধারণ করলো, তখন ওয়ালীউল্লাহ্ মর্মাহত হলেন। এ নিয়ে তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করতেন।

যাইহোক, সে প্রসঙ্গে নয় এখানে অ্যান-মারি বর্ণিত ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দালুসিয়া সফর সম্পর্কেই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা সীমিত থাকবে। তাঁর পাঠকমাত্রেই জানেন যে ধর্মান্ধ অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের অধঃপতনে তিনি ছিলেন খুবই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও ব্যথিত। শুধু বাঙালি মুসলমান নয় পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানদের শোচণীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে আন্দালুসীয় সভ্যতা তাঁর কাছে মুসলমানদের জন্য একটি উজ্জ্বল আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছে। সে-কারণেও স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তা ছাড়া আরো একটি ব্যাপার ছিলো, আধুনিক হিস্পানী সাহিত্যের ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন একজন গভীর পাঠক।

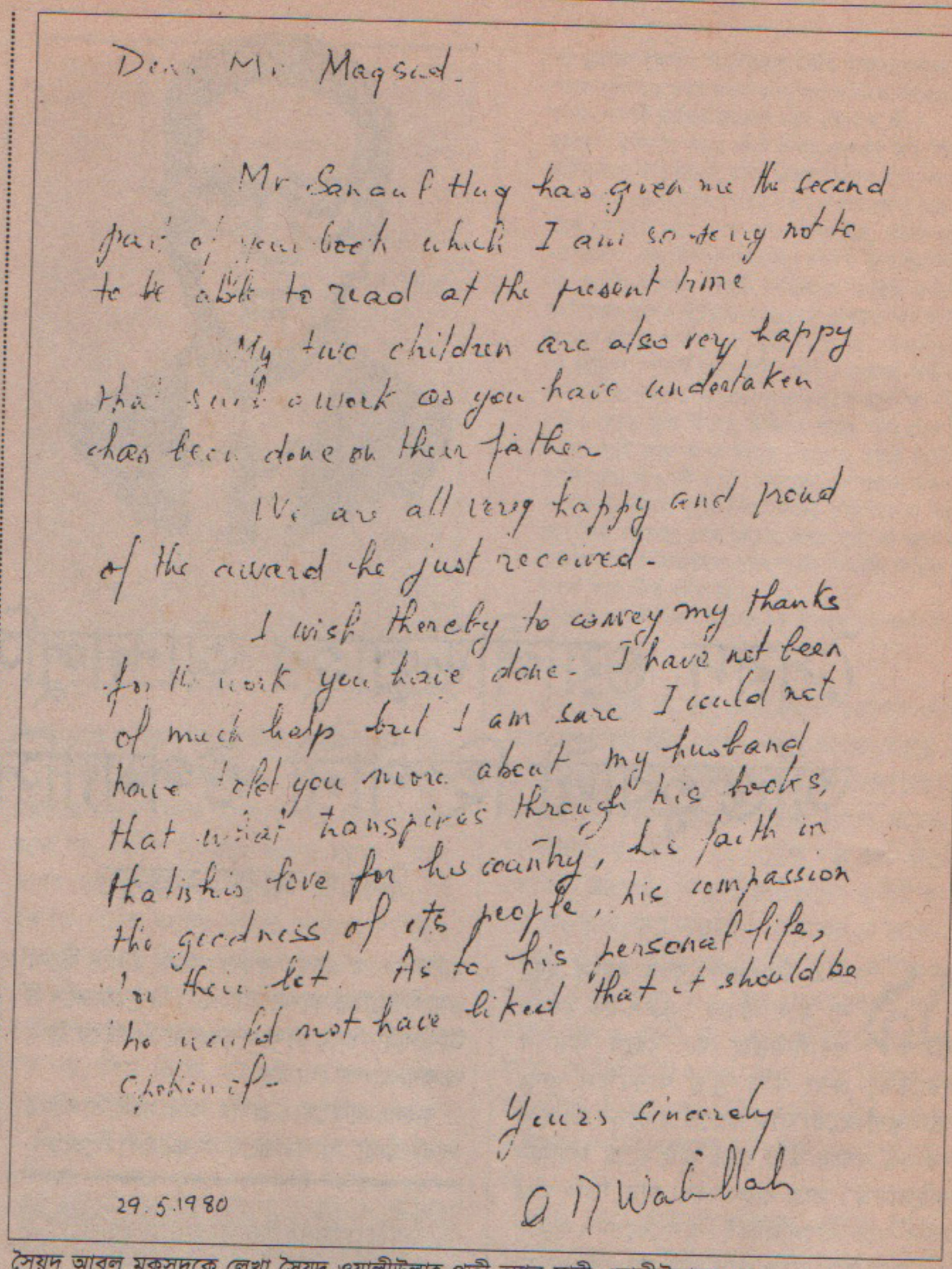

Dear Mr Maqsud.

Mr Sanaul Huq has given me the second part of your book which I am looking not to be able to read at the present time

My two children are also very happy that such a work as you have undertaken has been done on their father

We are all very happy and proud of the award she just received.

I wish thereby to convey my thanks for the work you have done. I have not been of much help but I am sure I could not have told you more about my husband that what transpires through his books, that is his love for his country, his faith in the goodness of its people, his compassion for their lot. As to his personal life, he would not have liked that it should be taken up.

Yours sincerely

A M Wahidullah

29.5.1980

সৈয়দ আবুল মকসুদকে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পত্নী অ্যান-মারী ওয়ালীউল্লাহ্র পত্র

রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই স্পেন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। পঞ্চম শতক থেকে সেখানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিত হয়, কিন্তু মাত্র দু'শ বছরের মধ্যে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা সেখানে প্রবেশ করে। মুসলিম শাসনকালেরই শেষ পর্যায়ে 'স্পেনীয় জাতীয়তাবাদ' গড়ে ওঠে। গ্রানাডার পতনের পর থেকেই সেখানে পুনরায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে এবং আজো স্পেনের 'রাষ্ট্রধর্ম' রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত।

এখানে স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে একটুখানি বলা প্রয়োজন। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেন একটি ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। কারণ মুসলিম শাসনকালে দেশটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সামরিক ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছিলো। তাতে স্পেন একটি ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সম্প্রসারণবাদী শক্তিতে পরিণত হয় এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনগ্রসর দেশগুলোর প্রতি থাবা বিস্তার করে। স্পেনের খ্রিষ্টান শাসকরা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো উপনিবেশিত করে এবং সেখানে চালায় শাসন-শোষণ-নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসন। সেখানকার দেশ ও জাতিগুলোর স্থানীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম প্রভৃতি ধ্বংস করে স্থাপন করা হয় হিস্পানী ভাষা ও সাহিত্য এবং ক্যাথলিক ধর্ম। সেখানকার মানুষদের করা হয় ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থে উনিশ শতক থেকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন দেশ দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই বা প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

গত শতকে এক পর্যায়ে স্পেন হারায় তার কয়েকটি উপনিবেশ যেমন- মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশ। স্পেনের এই শতকের ইতিহাসও বিচিত্র। সে-এক ভয়াবহ অরাজকতা, স্বৈরশাসন ও রক্তপাতের ইতিহাস। ১৯৩০-এর দশকে স্পেন প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষিত হয় এবং গির্জার প্রভাব রাষ্ট্রীয়পর্যায়ে সংকুচিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সূচনা লক্ষ্য করা যায়। মধ্য-তিরিশ নাগাদ গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয় দেশটি, রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত থাকে অনেকদিন। কমিউনিস্ট, প্রজাতন্ত্রী, সশস্ত্র উগ্রপন্থী সকলের সমন্বয়ে 'পপুলার ফ্রন্ট' গড়ে ওঠে। রক্ষণশীলদের উত্থান ঘটে। সশস্ত্র বাহিনী ফ্রানসিস্‌কো ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তিন বছরের গৃহযুদ্ধে অন্তত দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। সেই গোলযোগের মধ্যেই ফেদেরিকো গারথিয়া লোর্কা নিহত হন। সংখ্যাহীন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী নির্যাতিত হন অথবা দেশ থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। দেশান্তরী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন পিকাসো। ফরাশিদেশেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর শিল্পকর্মের গভীর অনুরাগী ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। বিশেষ করে তাঁর স্বৈরশাসনবিরোধী চেতনাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। পিকাসোর চিত্রকর্মের সংগ্রহগুলো বহুবার ঘুরে দেখেছেন ওয়ালীউল্লাহ্। তবে অ্যান-মারি বললেন, এ শতকের যে-সকল ঔপন্যাসিকের লেখা ওয়ালীউল্লাহ্ বিশেষভাবে আগ্রহ নিয়ে পড়তেন তাঁদের মধ্যে স্পেনের প্রভাবশালী সাহিত্যব্যক্তিত্ব মিগুয়েল দ্য উনামুনো (১৮৬৪-১৯৩৬) প্রধান। তাঁর প্রসঙ্গে পরে আসছি।

মিসেস অ্যান-মারি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছিলেন তাঁদের আন্দালুসিয়া সফরের ঘটনা, যা খুবই আকর্ষণীয় এবং ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্যবিচারের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। ১৯৬১-তে ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিসে আসেন, তার আগে আঠার মাস ছিলেন জার্মানীর তৎকালীন রাজধানী বন্-এ। সেখান থেকে প্যারিসে পাকিস্তানী দূতাবাসে বদলি হন প্রথম সচিব হিশেবে। অল্পদিন আগে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকরূপে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। তখন সাহিত্যচর্চায় পুনরায় তৎপর হয়ে ওঠেন। বলতেন, এখন থেকে শুধু লিখবেন, লিখবেন এবং লিখবেন। লিখলেনও। অল্পদিনের মধ্যেই শেষ করলেন *'চাঁদের অমাবস্যা'*। ১৯৬২-তে ছয় সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তিনি সপরিবারে স্পেন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম স্পেনের আন্দালুস প্রদেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন দেখা। ইতালীয় রেনেসাঁর বহু আগে, ইউরোপ যখন অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন এক মহান সভ্যতার আলো জ্বলে উঠেছিলো আন্দালুসিয়ায় ন' থেকে এগার শতকে। অ্যান-মারির ভাষায়, শুধু মুসলমানদের নয় যা পৃথিবীর ইতিহাসেরই এক মহান অধ্যায়। The most interesting period in the Muslim history. It was a period of freedom—a period of Enlightenment. সেটি সকল সংকীর্ণতামুক্ত এক সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষকাল।

কয়েকদিন গাড়ি চালিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিস থেকে বার্সিলোনা হয়ে ভ্যালেসিয়া, মুর্সিয়া, গ্রানাডা হয়ে সেভিন পৌঁছেন। ফেরার পথে মাদ্রিদে কয়েকদিন। অ্যান-মারি বললেন, সে এক চমৎকার অভিযাত্রা। সঙ্গে ছিলেন অ্যান-মারির মা এবং বছর তিনেকের কন্যা সিমিন। ব্যাপক ঘুরে বেড়ালেন গুয়াদালায়ারা, তলেদো, বারগোস, সোরিয়া প্রভৃতি প্রাচীন শহর ও নগর। যাত্রা হয়েছিলো খুবই আনন্দদায়ক। মোটর ভ্রমণ খুবই উপভোগ করেছিলেন সকলেই। আন্দালুসীয় সমতলের দ্রাক্ষাকুঞ্জ, কমলালেবু বা জলপাই বাগান; মাঝে মাঝে গম, যব, ওট, ধান বা আখের ক্ষেত প্রভৃতি। হৃদয়হরণকারী ভূ-প্রকৃতি। পাহাড়-পর্বতমালা, বনভূমি, পাইন ও ওকের সারি। তা ছাড়া যাত্রাকালে পথে ভূমধ্যসাগরীয় খাবার ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর সফরসঙ্গীরা খুবই উপভোগ করেন।

কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্র আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো আলমেরিয়া, মুর্সিয়া, গ্রানাডা, মালাগা, কর্ডোভা, কাদিস, সেভিল প্রভৃতি নগরীর প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ। (আরো দু'একটি ছোটো শহর ও ঐতিহাসিক জায়গার নাম তিনি বলেন যার সঠিক উচ্চারণ আমি উদ্ধার করতে পারি নি।) নয় ও দশ শতকে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মুসলমানরা অকল্পনীয় উন্নতি করেছিলো আন্দালুসিয়ায়। সেকালে সেটাই ছিলো সবচেয়ে আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্র। শত শত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো আলমেরিয়া, কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডা, তলেদো প্রভৃতি নগরীতে। ছিলো অসংখ্য গণ-গ্রন্থাগার। ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন শুধু নয়, তত্ত্বমূলক শিক্ষাও শুধু নয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষাও প্রচলিত ছিলো। চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি পড়ানো হতো। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ যেখানে মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি সকল ধর্মের শিক্ষার্থীরাই জ্ঞানচর্চা করতেন। জ্ঞানচর্চা ও তত্ত্বালোচনার জন্য আন্দালুসিয়া হয়ে ওঠে পৃথিবীর আদর্শ।

অ্যান-মারি শিশুর মতো কৌতূহলে, আমার অনুরোধে, বর্ণনা দিচ্ছিলেন তলেদো, আলমেরিয়া প্রভৃতি নগরীর অপরূপ সৌন্দর্য— সেখানকার প্রাচীন স্থাপত্য, পুরনো দিনের শিল্পকলা প্রভৃতি। আলমেরিয়ার একটি প্রাগ্‌ঐতিহাসিক গুহা তাঁরা পরিদর্শন করেন। প্যারিসে প্রত্যাবর্তনের পথে মাদ্রিদে অবস্থান করেন কয়েকদিন এবং সেখানে বিশাল ও বিশ্ববিখ্যাত লা প্রাদো চিত্রসংগ্রহশালাসহ নানা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ১৯৬৪-তে পর্তুগালে যাবার পথে পুনরায় অল্পকাল মাদ্রিদে অবস্থান করেন এবং আধুনিক স্পেনের শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে নানা তথ্য অবগত হন ওয়ালীউল্লাহ্।

স্পেনের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি শুধু নয় হিস্পানী চিত্রশিল্প, সাহিত্য, বিশেষ করে সেখানকার আধুনিক কথাসাহিত্য সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্র আগ্রহ ছিলো অসামান্য। উনিশ শতকের হিস্পানী উপন্যাস ও নাটক তিনি উপভোগ করতেন। বিশেষ করে যে-সকল উপন্যাসের পটভূমি আন্দালুসিয়া সেগুলো ছিলো তাঁর প্রিয়পাঠ্য। স্পেনের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলো তাঁর আগ্রহ সঞ্চার করে। আন্দালুসীয় পেড্রো আন্তোনিয় দ্য আলারকোন (১৮৩৩-৯১), হুয়ান ভালেরা (১৮২৪-১৯০৫), হোসে মারিয়া দ্য পেরেদা (১৮৩৩-১৯০৬) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বাস্তবধর্মী উপন্যাস সংগ্রহ করে পড়েছেন তিনি। দক্ষিণ স্পেনের মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং পল্লীর মানুষের জীবনযাত্রা যে-সকল উপন্যাসের বিষয়বস্তু সেগুলো তাঁকে আকর্ষণ করতো।

আধুনিক হিস্পানী সাহিত্যে '১৮৯৮ প্রজন্ম' ('The Generation of 1898')-এর ঔপন্যাসিকগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে ওই দলের লেখকদের মধ্যে উনামুনো খুবই খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধের বইগুলো ওয়ালীউল্লাহ্ সংগ্রহ করে পড়েছেন। ওই প্রজন্মের লেখকগণ এবং তাঁদের অব্যবহিত পরবর্তীকালের কবি ও

স্পেনের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি শুধু নয় হিস্পানী চিত্রশিল্প, সাহিত্য, বিশেষ করে সেখানকার আধুনিক কথাসাহিত্য সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্র আগ্রহ ছিলো অসামান্য। উনিশ শতকের হিস্পানী উপন্যাস ও নাটক তিনি উপভোগ করতেন। বিশেষ করে যে-সকল উপন্যাসের পটভূমি আন্দালুসিয়া সেগুলো ছিলো তাঁর প্রিয়পাঠ্য।

ঔপন্যাসিকগণের কেউ কেউ পরে নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত অর্জন করেন। যেমন কাসিলো হোসে সেলা এবং হাসিন্তো বেনাভেন্ত প্রমুখ। পিত্ত বারোজা (১৮৭২-১৯৫৬) এবং বিকার্দো লিওন (১৮৭৭-১৯৪৩) প্রমুখের দার্শনিক ও মননশীল উপন্যাস পরবর্তী প্রজন্মের ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রিয় লেখক উনামুনো ছিলেন দর্শনের ছাত্র। কর্মজীবনে ছিলেন গ্রিক সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সালামানকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটরের পদ থেকে অপসারিত হন। জেনারেল প্রিমো দ্য রিভেরা-এর একনায়কত্বের বিরোধিতা করায় তিনি একবার নির্বাসিতও হন এবং ১৯২০-এর দশকে ছ'বছর ফরাশি দেশে অবস্থান করেন। পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু অনুকূল হলে দেশে ফিরে জাতীয় পরিষদ 'কোর্টেজ'-এর সদস্য হন। তিনি শুধু একনায়কত্ব নয়, ছিলেন রাজতন্ত্রেরও বিরোধী। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় উনামুনো কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী থাকেন এবং গৃহবন্দী থাকা অবস্থায়ই ১৯৩৬-এ মারা যান। '১৮৯৮ প্রজন্মে'র লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ। কার্লাইলের 'ফরাসি বিপ্লব' তিনি হিস্পানী ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রথম উপন্যাস Paz en la guerra (১৮৯৭) তাঁর শৈশবের স্মৃতিভিত্তিক উপাখ্যান। এতে বিবৃত হয়েছে বিলবাও (Bilbao) অঞ্চলের কথা। এ গ্রন্থটিকে চিহ্নিত করা হয় একটি 'অস্তিত্ববাদী উপন্যাস' হিশেবে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Life of Don Quixote and Sancho ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৯২৭-এ। উনামুনোর শ্রেষ্ট সাহিত্যকর্ম The Tragic Sense of Life in Men and in Peoples প্রকাশিত হয় ১৯১৩-তে এবং ইংরেজি সংস্করণ বেরোয় ১৯২১-এ। বিশ্বাস এবং যুক্তির ভেতরকার সীমারেখা এবং তাদের মধ্যে ব্যবধানটি কি ধরনের তা অনুসন্ধান করেছেন তিনি তাঁর উপন্যাস-প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখায়। তিনি নিজে ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন ক্যাথলিক। প্রধানত ব্যক্তি-মানুষের সমস্যাই তাঁর বিশ্লেষণের বিষয়, যূথবদ্ধ সামাজিক প্রাণীরূপে তার অস্তিত্বের প্রশ্ন পরে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাঁর নায়করা সন্দেহ ও বিবেকের তাড়নায় তীব্র মানসিক যন্ত্রণার শিকার। তাঁর উপন্যাস Niebla (১৯১৪, ইংরেজি সংস্করণ ১৯২৮)-এর চরিত্ররা বাস্তবজগতের সাধারণ মানুষ। তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস San Manuel Bueno, martir তাঁর মৃত্যুর অল্প আগে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩-এ। এটি একজন অবিশ্বাসী ধর্মযাজকের জীবনালেখ্য। (উনামুনো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে জে.বি. ট্রেণ্ড-এর গ্রন্থে)।

শুধু স্প্যানিস নয় সকল প্রধান ভাষার আধুনিক

ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রিয় লেখক উনামুনো ছিলেন দর্শনের ছাত্র। কর্মজীবনে ছিলেন গ্রিক সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সালামানকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটরের পদ থেকে অপসারিত হন। জেনারেল প্রিমো দ্য রিভেরা-এর একনায়কত্বের বিরোধিতা করায় তিনি একবার নির্বাসিতও হন এবং ১৯২০-এর দশকে ছ'বছর ফরাশি দেশে অবস্থান করেন।

ও ক্লাসিক সাহিত্যেই উৎসাহ ছিলো ওয়ালীউল্লাহ্‌র। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, তাদের নিয়তি তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই পৃথিবীর পথে চলবার ব্যাকুলতা ছিলো তাঁর। জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা সত্বেও, স্বদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের প্রতি তীব্র সহানুভূতি সত্বেও তিনি ছিলেন বিশ্বনাগরিক।

কোনো দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি রাতারাতি বদলে যেতে পারে, যেমন গিয়েছিলো বাংলাদেশের আগস্ট ১৯৪৭, অক্টোবর ১৯৫৮, মার্চ ১৯৭১, জানুয়ারি ১৯৭৫, আগস্ট ১৯৭৫-এ, কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা একদিনে বা এক দশকে বদলায় না। সে-জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় এবং কঠোর সংস্কারমূলক আন্দোলন। বাঙালির বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ১৯৪০ বা ১৯৫০-এর দশকে যেমনটি ছিলো ১৯৬০-এর দশকে তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। ওয়ালীউল্লাহ্ প্রচারধর্মী রাজনৈতিক লেখক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মূলত শিল্পী এবং ভাষাশিল্পী। সুতরাং দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক চিত্র তাঁর সাহিত্যে না থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর আগ্রহ আবর্তিত হয়ে ছিলো এক জনগোষ্ঠীর সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অর্থাৎ তার মনোজগতের অবস্থাকে কেন্দ্র করে। সে-জন্য তিনি সাহিত্যচর্চার সময় দেশে থাকলেন কি প্রবাসে রইলেন তা বিবেচনার বিশেষ প্রয়োজন নেই। তাই যখন কেউ তাঁর প্রবাসজীবন নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন তখন তিনি আহত হতেন, কিছুটা ক্ষুব্ধও। তাঁর *'কাঁদো নদী কাঁদো'* প্রকাশিত হলে তার কিছু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিলো। আমি নিজেও একটি সমালোচনা লিখেছিলাম ১৯৭০-৩ মোহাম্মদ নাসির আলীর অনুরোধে, সেটিও ছিলো নিতান্ত অনুপযুক্ত আলোচনা। যাই হোক, আবুল ফজলও একটি সমালোচনা করেন, যেটি শওকত ওসমান পাঠিয়ে দেন ওয়ালীউল্লাহ্‌কে প্যারিসে। সে আলোচনা পড়ে তিনি শওকত ওসমানকে লেখেন :

'চিঠিটা লিখছি ধন্যবাদ (শব্দটা বড়ই বিদঘুটে) জানাবার জন্যে। আবুল ফজলের সমালোচনা পাঠিয়েছ বলে। আমি বিদেশে ব'লে সবাই আকারে-ইঙ্গিতে একটা খোঁটা না দিয়ে পারেন না। উনি বলেছেন দশ-বারো বছরে দেশে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যার খবর আমি রাখি না। শুনে বড় খুশী হলাম, কারণ দেশের পরিবর্তন হয়েছে তা সুখবরই বৈ কি। তবে কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে তা জানতে পারলে জ্ঞানবৃদ্ধি হতো, লেখাও সমসাময়িক হতো। তিনি আরো লিখেছেন, মুহাম্মদ মুস্তফার মত লোকেরা কখনো আত্মহত্যা করে না। এ-কথাও নিতান্ত খাঁটি। তবে সেই জন্যেই তো আমার মুহাম্মদ মুস্তফা আত্মহত্যা করেছে। দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকও ও-সব ভাবে না করে না যা 'চাঁদের অমাবস্যা'র যুবকশিক্ষকটি ভেবেছে বা করেছে। আমার ইচ্ছা সাংবাদিক কাগজের রিপোর্টারের উর্ধে ওঠা। কিন্তু তোমরা যেন চাও সাহিত্যিক রিপোর্টার হয়েই থাকুক। সেটি হবে না। তা হলে কষ্ট ক'রে লেখার প্রয়োজন কী? মনের কোণে লুকানো আশা বা স্বপ্নের (সে-সবের দাম যা-ই হোক) কথা কিছু প্রকাশ না করলে চলে কী ক'রে?

এমন লোক জানো যে বেশ বিদগ্ধমানুষ কিন্তু জানে না আমি বিদেশে থাকি? তেমন লোকের মত শুনতে ইচ্ছা করে। একটা কথা। বিদেশে থাকলেও দেশান্তর ঘটে নি : মানে ইমিগ্রেন্ট-এর দলে ঢুকি নি। দুটো আলাদা জিনিস– সেটা কী ক'রে বুঝাই।'

[*সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৩৭, ১৯৮৩, ঢাকা]

তাঁর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই শুরুতে বলেছি দীর্ঘায়ু পেলে আরো কিছু মূল্যবান রচনা সৃষ্টি করা ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্য কঠিন হতো না। উৎকৃষ্ট বিশ্বমানের সাহিত্য প্রণয়ন করবেন বলে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। সেই প্রস্তুতি সম্পর্কে যতোই জানা যাচ্ছে ততোই তাঁর অভাবটা অতিমাত্রায় অনুভূত হচ্ছে।

পুনশ্চ : এই লেখাটি শেষ হতে না হতেই ১৪ জুলাই সকালে সংবাদ পেলাম ১১ জুলাই প্যারিসে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মিসেস অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্ মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৮। ফেব্রুয়ারি '৯৬তে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। তাঁর অনূদিত *'লালসালু'*র ফরাশি অনুবাদ ১৯৬৩-তে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় এবং প্রশংসিতও হয়। সম্প্রতি তিনি *'চাঁদের অমাবস্যা'*র ফরাশি অনুবাদ শেষ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন তাঁর বিবাহিতা কন্যা সিমিন, পুত্র ইরাজ এবং এক নাতি ও এক নাতনী। তাঁর মাও জীবিত। গতবার ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয় এবং বর্তমান লেখাটি তাঁর সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই রচিত। অধিকাংশ তথ্যই তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই শ্রদ্ধা। ৩৪

মুক্তিযুদ্ধ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর নাটক

শান্তনু কায়সার

অবরুদ্ধ স্বদেশের অবরুদ্ধ প্রধান নগরে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে অবস্থান করছি। সন্ত্রস্ত নগরবাসীর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নানা কর্মকাণ্ড তখন আশার সঞ্চার করে চলেছে। এরকম একটা সময়ে অক্টোবরের ১১ কি ১২ তারিখে 'দৈনিক পাকিস্তানে'র একটি সংবাদে জানতে পারলাম, আমাদের বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেছেন। ঐদিন কিংবা তার পরের রোববারে ঐ দৈনিকের সাহিত্য পাতার পুরোটা ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে ও তাঁর লেখা দিয়ে সজ্জিত। কলকাতায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত 'কমরেড পাবলিশার্স' যে আহসান হাবীবের প্রথম কবিতার বই 'রাত্রিশেষ' ১৯৪৬-এ প্রকাশ করে সেই কবিই তখন ঐ সাহিত্যপাতার সম্পাদক। বহুনিন্দিত প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা এবং ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে স্বৈরাচারের মুখপত্র হিসেবে কুখ্যাত 'মর্নিং নিউজ'-এর সঙ্গে একই দালানে অবস্থিত ১ ডি আই টি এভিন্যুর 'দৈনিক পাকিস্তান' গণরোষের শিকার হওয়া সত্ত্বেও আহসান হাবীবের রুচিশীল সম্পাদনা ও অগ্রসর ভাবনার কারণে ওই দৈনিকের সাহিত্যপাতা সুধীজনের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এছাড়া ওই দৈনিকে তখন বেশ কজন প্রগতিশীল কবি, শিল্পী ও লেখক কর্মরত ছিলেন। একারণে সত্তরের নির্বাচনোত্তর মার্চ মাসে (১৯৭১) শওকত ওসমান অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে বেশ কিছু ধারাবাহিক লেখা এ পত্রিকার উপসম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করেছিলেন। ২৫শে মার্চের গণহত্যার পর অবরুদ্ধ স্বদেশে সকল পত্র-পত্রিকাই পাকিস্তানী হায়েনাদের হাতে বন্দী হয় এবং স্বভাবতই এখান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিষয়ে মানুষ তার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তবু, এর মধ্যেই, মানুষ তার প্রয়োজনীয় সংবাদ খুঁজে পেতে ও নিতে মোটেও ভুল করে না। পাকিস্তান সরকার, তার উচ্ছিষ্টভোগী রাজাকার ও গণবিরোধী রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহ এবং অবরুদ্ধ গণমাধ্যম যাদেরকে 'দুষ্কৃতিকারী' বলে চিহ্নিত করছে তাদের তৎপরতা দেশবাসীকে আশান্বিত করে। এভাবে বৈরীশক্তির নেতিবাচক সংবাদ ও বিশ্লেষণ থেকে অবরুদ্ধ নাগরিকদের পক্ষে ইতিবাচক ইঙ্গিত গ্রহণ সম্ভব হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মৃত্যু

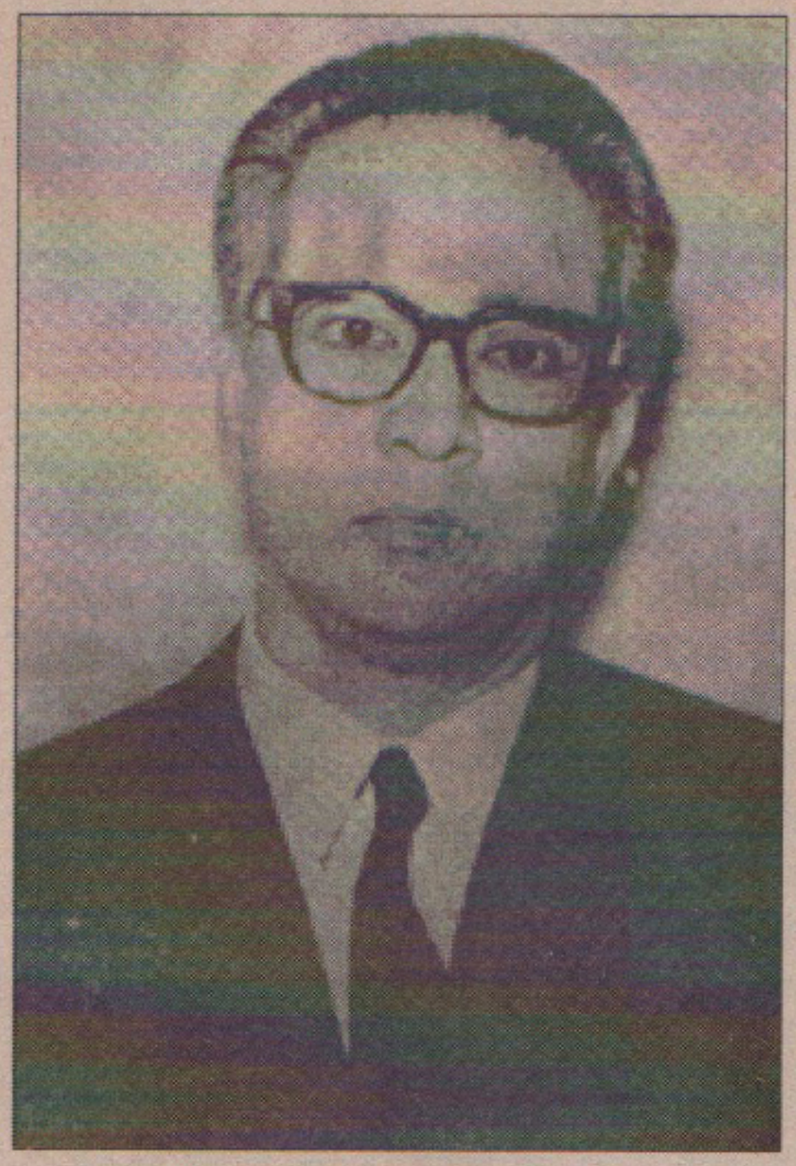

উপলক্ষে কবি আহসান হাবীব ও সংশ্লিষ্টজনেরা আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মের দিকে মুখ ফেরানোর মধ্য দিয়ে আসলে মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক চেতনাকেই অবরুদ্ধ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। বলাই বাহুল্য, তাও ছিল ভিন্ন এক মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে বাংলাদেশের সপক্ষে প্যারিসকেন্দ্রিক বিশ্বজনমত গড়ে তোলায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ছিল অগ্রগণ্য ভূমিকা। ১৯৬৭-র আগস্টে প্যারিসে তিনি ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬১-তে পাক দূতাবাসে প্রেস এটাশি হিসেবে বদলি হয়ে ইউনেস্কোর ওই পদে যোগ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান দূতাবাসে তিনি ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু ইউনেস্কোর চাকরি পাবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা থেকে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের পক্ষে তো বটেই, ওয়ালীউল্লাহ্র মতো প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেও কেন পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না। সৈয়দ আবুল মকসুদের 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য' থেকে যে জানা যায় বিষয়টিকে পাকিস্তানী আমলা ও কর্তৃপক্ষ যেভাবে রাষ্ট্র বনাম ওয়ালীউল্লাহ্ হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল কিংবা ইসলামাবাদে বদলি হওয়ার শর্তে তাঁর চাকরি বহাল রাখতে চেয়েছিল তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওই রাষ্ট্রকাঠামোর কাছে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে নিজের ও জাতিসত্তার অধিকার ও মর্যাদাবোধকেই তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন আগে ৫ই অক্টোবরে শওকত ওসমানকে লেখা চিঠিতে তাই তিনি যেমন পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় তাঁর ইউনেস্কোর চাকরিচ্যুতি বিষয়ক মোকদ্দমার পরবর্তী তারিখ জানান তেমনি প্যারিসে ফরাসিদের বাংলাদেশ কমিটি গঠন করার কথাও লেখেন। এভাবে ব্যক্তির সঙ্গে জাতির সমসা ও আকাঙ্ক্ষার যোগসূত্র ও মেলবন্ধন ঘটে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের জন্মের স্বল্পকাল পূর্বে সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু পরিকল্পিত বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার সমর্থনে অন্য অনেকের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন, পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যেমন প্রকৃত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল তেমনি ওই রাষ্ট্রকাঠামো হতে পারতো না এ অঞ্চলে তার নাগরিকদের বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এরই চূড়ান্ত পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তার প্রত্যক্ষ যে পরিচয় পেয়েছিলেন তার ফলে তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের ওই সময়েও আত্মসমর্পণ তো দূরের কথা, তাকে সমর্থন করাও সম্ভব ছিল না। বরং 'লালসালু' ও 'চাঁদের অমাবস্যা'র অন্ধকার ওই জগৎকে পরিত্যাগ করে নতুন অন্বেষায় নদীর কান্নার বহুদূর গভীরে গিয়ে তার ডাকে সাড়া দেয়ার অন্তর্তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন। সে কারণে নয়াদিল্লীকেন্দ্রিক International Conference on Bangladesh-এর পক্ষ থেকে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে তাঁকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণই শুধু জানানো হয় না, বরং উনসত্তর বছর বয়স্ক রাজনীতিক-সৈনিক-লেখক আঁদ্রে মালরো, দার্শনিক-লেখক জাঁ পল সার্ত, সিমন দ্য বুভুয়ার প্রমুখের তাতে অংশগ্রহণের সম্মতি আদায়ের বিষয়েও তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা থেকে ১৯৭২-

এর ৫ই এপ্রিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর পত্নীকে যথার্থই লেখেন, Permit me to say that your personal loss in also a loss to Bangladesh and Bengali language and literature.

কিন্তু ব্যক্তিগত বিপর্যয় সত্ত্বেও প্যারিসে তাঁর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মুক্তিযুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করেন তার গুরুত্বকে খাটো না করেও বলা প্রয়োজন, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পালিত তাঁর ধারাবাহিক ও সৃজনশীল ভূমিকাই ছিল মুক্তিযুদ্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

দুই.

এক্ষেত্রে তাঁর নাট্যরচনা লেখকের ওই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারে। কাকতালীয় হলেও এ ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, গণনাট্য আন্দোলনের সূচনাপর্বের নাটক 'নবান্ন'র প্রথম মঞ্চায়নে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও শিল্পী জয়নুল আবেদীন। ১৯৪৪-এর ৭ই নভেম্বর সৈয়দ নূরুদ্দিনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, 'বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকটা অভিনীত হয়েছে নিশ্চয়ই জানো। অভিনয়ের প্রথম দিন আমাকে ও জয়নুলকে ওরা নিমন্ত্রণ করেছিলো। আগাগোড়া ভালো লাগলো....। অভিনয়ের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের এবং কল্যাণী কুমার মঙ্গলমের অভিনয় অদ্ভুত সুন্দর লেগেছে। তাছাড়া গোপাল হালদারের অতি ছোট একটি অভিনয় চমৎকার লেগেছে। ডেস্টেট্যুটদের গাঁয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে সরকার, ফুটপাতে বসে-থাকা ওদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য এসেছে, শংকাও, একটু দূরে অল্প আঁধারের মধ্যে উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে গোপাল হালদার বিচিত্র সুরে বারে বারে একটা কথা শুধু বলছেন : তোমরা সব গাঁয়ে ফিরে যাও।...'যাও' শব্দটা এতো বিচিত্র সুরে বলেছেন যে অন্তরে গিয়ে ঘা দিয়েছে। গোপাল হালদার অভিনয়ের সময় (ওঁর রোলটার সময়টুকু ছাড়া) আমার ও জয়নুলের মাঝখানে বসেছিলেন।'

অগ্রন্থিত 'উজানে মৃত্যু' একাঙ্কিকা ও কিশোর-নাট্য 'সুরঙ্গ' ছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র দুটি প্রধান নাট্যরচনা 'বহিপীর' ও 'তরঙ্গভঙ্গ'। কিন্তু কিশোরদের জন্যে লেখা হলেও 'সুরঙ্গে'র বিষয়বস্তুতে সুশান্তির পরিবর্তে বয়ঃসন্ধিকালেই উন্মোচিত হয় প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষমাহীন জগৎ।

সৈয়দ আবুল মকসুদের 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য' থেকে জানা যায় ১৯৫১ সালের ১১ই মে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে প্রেস এটাশি করে করাচী থেকে বদলি করা হয় নয়াদিল্লীতে, সেখান থকে বায়ান্নোর অক্টোবরের শেষ দিকে একই পদে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে বদলি হন। ওখানেই হবু পত্নী এ্যান মারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও হৃদয় বিনিময় হয়। সিডনীতে তিনি থাকেন চুয়ান্নর ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত। অতঃপর তাঁকে ঢাকায় বদলি করা হয়। এসময় তিনি থাকতেন সার্কিট হাউসে, কিন্তু খেতেন সৈয়দ নূরুদ্দিনের বাসায়। এক সন্ধ্যায় নূরুদ্দিনের সেগুনবাগিচার বাসায় তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বহিপীর' পড়া হয়, যার রচনা তিনি শুরু করেছিলেন সিডনীতে, কিন্তু শেষ করেন ঢাকায়।

এ ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করলেও ওয়ালীউল্লাহ্ ভাষা-আন্দোলন-উত্তর চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত ঘটনাবলী নিশ্চয়ই খুবই ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন। নাটকটির বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার আগে তৎকালীন গণজাগরণের একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ যদি আমরা এখানে উপস্থিত করি তাহলে 'বহিপীরে'র পৃষ্ঠপট ও তার সামগ্রিক গুরুত্ব অনুধাবন সহজ হবে। আবদুল হক 'নির্বাচন প্রসঙ্গ' শীর্ষক তাঁর ১৯৫৪-র ৭ই মার্চের দিনপঞ্জির শুরুতেই লিখেছেন, 'সরকারি আইনমতে আজ সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারণা শেষ হলো। আগামীকাল নির্বাচন আরম্ভ।' এরপর 'গণজাগরণ' শিরোনামে তিনি যে মূল্যায়ন করেছেন সেটাই আমাদের জন্যে প্রাসঙ্গিক ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ : 'নির্বাচন উপলক্ষে যে গণচেতনা লক্ষ্য করা গেলো তা অভূতপূর্ব। যেখানেই যাই, যেখানেই বসি সেখানেই দেখি, প্রায় সকলেই লীগের সমালোচনায় মুখর। অন্তত ঢাকায় লীগের সমর্থক প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে।' 'দেখলাম জনসাধারণ তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থার তারা পরিবর্তন চায়। এই কারণেই তারা যুক্তফ্রন্টের সমর্থক। তার মানে এই নয় যে তারা যুক্তফ্রন্টকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে। রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও লীগ বিরোধিতাই তাদেরকে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক করে তুলেছে। এক হিসেবে বলতে গেলে যুক্তফ্রন্ট তাদেরই সৃষ্টি, নেতাদের নয়। যুক্তফ্রন্ট থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে তাকে এখন তারা বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করে এবং মনে করবে। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যদি কখনো ভাঙন দেখা দেয় তবে তার প্রভাব এই সচেতন জনতার ওপর খুব বেশি হবে না। যুক্তফ্রন্টে যেসব দল শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে তাদেরকে তারা সমর্থন করে যাবে। তবে তাদের মধ্যে যে কিছুমাত্র ভাঙন আনবে না, কিছুমাত্র বিভ্রান্তি দেখা দেবে না তাও নয়। তাদের মধ্যে যে সচেতনতা আজ লক্ষ্য করছি তাকে যে পার্টি বা যে যে পার্টি রূপ দিতে পারবে তাকে তারা সমর্থন করবে।' 'এবারে নির্বাচন উপলক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি লক্ষ্য করলাম তা হচ্ছে এই যে, 'ইসলাম' ও 'পাকিস্তান বিপন্ন' বুলি শুনে তারা ভুলতে চায় না। তাদের যে রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক দাবি, যে ভাষা ও সংস্কৃতির দাবি, তা তারা ছাড়ছে না। এটা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা এখন রাজনীতিতে ধর্মের কথা শুনতে চায় না, তাদের মধ্যে এখন ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক আদর্শেরই বেশি প্রসার হচ্ছে এবং দ্রুত প্রসার হচ্ছে।' (লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ১৯৫৩-'৯৩)।

> ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের জন্মের স্বল্পকাল পূর্বে সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু পরিকল্পিত বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার সমর্থনে অন্য অনেকের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন, পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যেমন প্রকৃত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল তেমনি ওই রাষ্ট্রকাঠামো হতে পারতো না এ অঞ্চলে তার নাগরিকদের বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর দিনপঞ্জিতে আবদুল হক যে অনুভূতি ও ভাবনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন শিল্পঋদ্ধ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর নাট্যদ্বয়ে তাকে আরও গভীর করে তুলেছেন। মধ্যপঞ্চাশে লেখা 'বহিপীর'-এ এর প্রত্যক্ষ এবং 'তরঙ্গভঙ্গে' তার দূরতর কিন্তু দৃঢ় প্রভাব পড়েছে। ১৯৭১-এ যে মুক্তিযুদ্ধ হয় তার সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বিনির্মাণের এক প্রধান কুশীলব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আর এর সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর প্রধান দুটি নাট্যরচনা।

বহিপীর বইয়ের ভাষায় কথা বলার বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করে : 'এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। .... সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে-ভাষাতে আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান। তাহা ছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে। মনে হয় তাহাতে পবিত্রতা নাই। গাম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের ভাষার মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোন ভাষা নাই। কথ্যভাষা হইল হাট-মাঠের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।' আপাত নির্দোষ মনে হলেও এ হচ্ছে euphemism ভাষা ব্যবহারের ছদ্মরূপ, যা হিটলার তার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পরিচালনা ও চূড়ান্ত শয়তানিকে ধ্বনিমধুর কোমলতা দানের জন্যে ব্যবহার করতো। একারণেই দেখি নোশকা বা ওষুধ বলতে বহিপীর তার নিরুদ্দিষ্ট কিশোরী স্ত্রীকে বোঝায় এবং এভাবে হিটলারের মতোই সে তার ভাষাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে ও বৃহত্তর শোষণ-কাঠামোর কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। আবার বিষয়টি যে শুধু ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা তার দৃষ্টিভঙ্গি তথা দর্শনেরই অংশ তা বহিপীরের এই স্বগতোক্তি থেকে বোঝা যায় : 'কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য। এখন বুঝিলাম কী জন্য খোদা ঝড় উঠাইয়াছিলেন, কী জন্য আমার নৌকা আর এই বজরায় টক্কর লাগিল, কী জন্য এই বজরায় আমাকে তিনি উঠাইলেন। শুধু তাহাই নহে। কী জন্য আমার জ্বরটাও উঠিল। আমি নির্বোধের মত কত কী যে, বলিয়াছিলাম, আমার যাত্রায় কেন এই ব্যাঘাত ঘটিল, কী খোদার ইচ্ছা।'

সান্ধ্য আইনে নিলামে উঠতে যাওয়া জমিদার হাতেম আলীর বজরার সঙ্গে বৃদ্ধ পীরের নৌকার টক্কর লাগার ফলে তার পালিয়ে যাওয়া কিশোরী স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনায় পীর যে এখানে খোদার মহিমা উপলব্ধি করেন তা তার বস্তুস্বার্থের স্থূল প্রকাশ। এখনো কালো টাকার মালিকদের হজ্ব করে এসে 'আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বলেই হজ্ব করতে পেরেছি, অনেকের টাকা থাকলেও হজ্বের ভাগ্য হয় না' বলা কিংবা ধান্দাবাজি করে পাওয়া বস্তুস্বার্থের পেছনে খোদার ইচ্ছা কিংবা পিতা-মাতার দোওয়াকে প্রধান কারণ হিসেবে প্রচার করার পেছনে আসলে অন্যায় ও শোষণকে ঢাকা দিয়ে নিজেকে তার বিপরীত অবস্থানে দেখাবার লোভ ও মতলবই কাজ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার তৃণমূলের অবস্থান থেকে ওই মতলবকে যথাযথভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলেই চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচনে 'ধর্মে'র চেয়ে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের ওপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে। 'বহিপীরে' এর গভীর প্রকাশ ঘটেছে। পূর্ববর্তী 'লালসালু'র মজিদ এবং পরবর্তী 'চাঁদের অমাবস্যা'র কাদেরের প্রকৃত সহোদর নাটকের এই বহিপীর।

কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাস ও নাটকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাঁর প্রতিবাদের চেতনাকে উপস্থিত করেছেন। 'লালসালু'র মজিদ নিজের ও খালেক

> ব্যক্তিগত বিপর্যয় সত্ত্বেও প্যারিসে তাঁর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মুক্তিযুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করেন তার গুরুত্বকে খাটো না করেও বলা প্রয়োজন, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পালিত তাঁর ধারাবাহিক ও সৃজনশীল ভূমিকাই ছিল মুক্তিযুদ্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

ব্যাপারীর শক্তিতে বলীয়ান হলেও আক্কাস আলী বা জমিলার সঙ্গে এর প্রতিবাদে যুক্ত হয় হাসুনির মায়ের ক্ষ্যাপা বাপ। ঠিকমত সংগঠিত হতে না পারলেও কিংবা তার প্রতিবাদ পিছলে গেলেও সে তার অবস্থান থেকে নড়তে এতটুকুও সম্মত কিংবা প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে তারই স্ত্রী পুরুষশাসিত এ সমাজে নিজের স্বামীকে জব্দ করার কার্যকর কোনো অস্ত্র না পেয়ে পুরুষের দুর্বলতম জায়গা সন্তান তার নয়– বলে স্বামীর মর্মকে যেমন ক্ষতবিক্ষত করে তেমনি আবার নিজের দুর্বল অবস্থানের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ভেবেও হয়তো স্বস্তি পায়। 'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফেরও যখন আর কঠোর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার কোনো বিকল্প থাকে না তখন সে যে নামাজে সুরা লাহাব পড়ে তার পেছনে নিজের শক্তি সঞ্চয়ের প্রবণতাও কাজ করে। কারণ, সুরা লাহাব concrete terms-এ বর্ণিত। আবু লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস ও পতনের যে সংবাদ এ সুরায় বর্ণিত তা থেকে আরেফ নিজের পরিপার্শ্বের ভুল চরিত্র ও বিন্যাসের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়।

'লালসালু'র আক্কাসের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নস্যাৎ করার মধ্য দিয়ে মজিদ আসলে তারুণ্য ও জিজ্ঞাসাকেই আঘাত করে। কিন্তু 'বহিপীরে' তাহেরা ও হাসেম প্রতিক্রিয়াশীলতার জালকে ছিন্ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু তবু তার মৃত্যু ঘটে না। প্রথমে তাহেরাকে ফিরিয়ে দেয়ার শর্তেই শুধু বহিপীর হাতেম আলীকে সাহায্য করতে সম্মত হয়। কিন্তু পরে সে তার মূল স্বার্থ ও ভূমিকাতেই স্থিত হয় : 'তাহারা গিয়াছে, যাক। .... আসুন জমিদার সাহেব, আমরা আপনার জমিদারী রক্ষার ব্যবস্থা করি।' 'এতো বিচলিত হইবার কী আছে? আমরা সকলে তো রহিলাম। আমরা থাকিব।'

তিন.

'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'তরঙ্গভঙ্গ' শুধু সমকালের রচনাই নয়, বিষয় ও বিন্যাসেও তারা পরস্পরের নিকটবর্তী। উপন্যাসে জ্যোৎস্না-প্লাবিত শীতরাত্রিতে বাঁশঝাড়ে জনৈক মাঝির যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ কর্মে লিপ্ত থাকার সময় আরেফ ওই দৃশ্যটি দেখে ফেললে কাদের ওই যুবতীকে গলা টিপে হত্যা করে। অন্যদিকে নাটকে দেখা যায় নিজের কোলের সন্তানকে স্তন্যও দিতে অপারগ মাতা আমেনা ওই শিশুকে গলা টিপে হত্যা করে। আর এই দৃশ্যের সাক্ষী হয় মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী। 'চাঁদের অমাবস্যা'র কাদের সাধারণভাবে 'দরবেশ' বলে পরিচিত, অথচ নারী বিষয়ে তার ধারণা বড়ই স্থূল ও মধ্যযুগীয়। কাম ছাড়া এক্ষেত্রে সে তাকে প্রেমের দৃষ্টিতেও দেখতে রাজী নয়। অতএব চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচন পর্বে সাধারণ মানুষ শোষণ ও ভণ্ডামির কোন স্তর ও বাস্তবতা থেকে ইহজাগতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফ যেখানে সত্যকে আবিষ্কার করতে চায় সেখানে আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী তাকে বিকৃত অর্থাৎ স্থিতাবস্থার রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। 'কাঁদো নদী কাঁদো'তে এর একটি অভ্রান্ত উদাহরণ রয়েছে। মুহাম্মদ মুস্তফার পিতা খেদমতুল্লাহকে প্রভাবশালী কালু মিঞা হত্যা করেছে– জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত এই ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যে কালু মিঞা জুম্মার মসজিদে গিয়ে এর বিপরীত স্বীকারোক্তি করে। কারণ সমস্ত সংশয় সত্ত্বেও সে জানে, 'মসজিদে কেউ মিথ্যা বলে না'ই শেষ পর্যন্ত টিকে যাবে ও মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের বর্ণনা ও অন্য প্রতিক্রিয়া থেকে এও বোঝা যায়, সত্যকে চাপা দেওয়াও সহজ নয়। 'শত উপায়ে মানুষকে আত্মরক্ষা করতে হয়, কখনো সত্য বলে, কখনো মিথ্যে বলে। এবং কখনো সত্য অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার কখনো জলজ্যান্ত মিথ্যা বিচারকের ঘরেও অখণ্ডনীয় সত্য বলে গৃহীত হয়। কথাটি না বলে কালু মিঞার উপায়ই বা কী ছিলো।' 'বক্তৃতা কিছু সময়ের জন্য সকলে যেন বাকশূন্য হয়ে পড়ে। তাদের মনে হয়, মসজিদ ঘরে কথাটি বলে ধূর্ত কালু মিঞা আমাদের সঙ্গে বড়ই শয়তানি করেছে, যেন যাকে আমরা প্রায় ধরে ফেলেছিলাম সে হাত থেকে ফস্কে গিয়ে একটি দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। দুর্গটি সাধারণ দুর্গও নয়, আকায়িদ, ঈমানে তৈরি দুর্গ।' 'তরঙ্গভঙ্গে' এসে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়, 'পোশাক-পরিচ্ছদ, চেহারা-অবয়ব আসল সত্য নয়।' 'শয়তান

যেকোনো মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে। এমনকি সাদা ধবধবে লেবাসপরা মৌলবী মানুষের আকারও সে ধারণ করতে পারে।'

'চাঁদের অমাবস্যা'র 'আকায়িদ-ঈমান' 'তরঙ্গভঙ্গে' 'মাহজাব-তারিখ-আখলিয়া'তে রূপান্তরিত। এটি খুব নিরাপদ আশ্রয়, যার দোহাই দিয়ে চূড়ান্ত দুষ্কার্যেরও সাফাই গাওয়া সম্ভব। এর প্রবক্তা আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী স্থিতাবস্থা ও জড়ত্বকেও জীবন বলে চালাতে চায়। তার বক্তব্য, 'আমাদের মাহজাব-তারিখ-আখলিয়াত আজও জীবিত। শুধু জীবিত নয়, নদীর মতো বয়ে চলেছে, দেশে দেশে, যুগে যুগে প্রাণ সঞ্জীবিত করে, বিপথগামীকে সুপথে এনে, তৃষ্ণার্ত প্রাণে বেহেশতের সুধারসের স্পর্শ দিয়ে জাহেলের নিরাশা দূর করে।' এই 'আখলিয়াত' মুক্ত চিন্তার বিরোধী। আবদুস সাত্তারের ভাষ্য : 'হিজরীর তিন'শ ছ সালে দামাস্ক শহরে একদল মস্তিষ্কশূন্য লোক ফিরিঙ্গি ইহুদির আওতায় পড়ে। একদিন তাদের নেতা ইক্কায়িদ হঠাৎ প্রশ্ন তুললো, মানুষকে কোনো ধার্মিক নৈতিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত কিনা। অনেক আলোচনা তর্কবিতর্ক হলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো এই যে, মুক্ত মানুষই খোদার নির্দেশ দেখতে পায়। ভাগ্য ভালো ইক্কায়িদের দল ছিলো সংখ্যালঘিষ্ট, তারা জয়লাভ করে নি। তারা জয়লাভ করলে এতোদিনে আমাদের ইতিহাস বালুচরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো, তার স্নিগ্ধ শীতল ধ্বনি এই সুজলা-সুফলা দেশে এসে পৌঁছুতো না।' 'মাহজাব আখলিয়াত'কে আশ্রয় করে তারা সময়কে স্তব্ধ করে রাখতে চায়। কিন্তু নৈতিকতার ভান করলেও তাদের বস্তুজ্ঞান বড়ই টনটনে। তাই আবদুস সাত্তার বলে, 'তখন আমরা গোরু-ছাগলকে দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে রাখি সে দড়ি দশ গজ হবে না দুশ গজ হবে তা নির্ভর করে পড়শীর ক্ষেতের দূরত্বের উপর, গোরু-ছাগলের নৈতিক উন্নতির উপর নয়।' এভাবে তারা সবসময় সতর্ক— যেন স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। বারিশ পীর নেওলাপুরী সম্পর্কে ঠিকই বলে, 'খোদার খেয়াল, দুনিয়াদারীর খেয়াল— দুদিকেই সমান।' কিন্তু তাঁর সংশয় 'দুনিয়াদারীতে এতো খেয়াল থাকলে খোদার প্রতি খেয়াল কম হয়' সত্ত্বেও তিনি লেওলাপুরীকেই সমর্থন করেন। কারণ পীর বিশ্বাস করেন, 'দুই দিক ভালো থাকলে আদমীর কিমত হয়, পীরেরও ভালাই হয়।' পরে পীর তাঁর মুরীদ জজকে মনের কথা খুলে বলতে গিয়ে যা বলেন তাতে অধ্যাত্মচেতনার চেয়ে বাস্তববুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়, 'লোকে যা বলেন তাই করুন, না হলে আমাদের লোকসান পৌঁছাবে।'

এ নাটকে আমেনার নিজের সন্তান মেরে ফেলার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভিখারিণী বলে, 'অতি দরিদ্র মেয়ে। স্বামী বেঁচে নেই, কোন রোজগারের পথ নেই, অথচ ঘাড়ে চার-চারটে সন্তান। একদিন সহ্য করতে না পেরে কোলের শিশুটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে। বলতে গেলে নেহাৎ সাধারণ ঘটনা।' আবার স্বামীর মৃত্যুর কারণও আমেনা। ভিখারিণীর জবানবন্দী : 'রোগে মরণাপন্ন, তবু পেটে এক ফোঁটা ওষুধ নেই। কেবল তাবিজটা লকলক করে শীর্ণ বাহু থেকে। একদিন স্বামীর কষ্ট সহ্য হয় না। তাই ধুতরা পাতার রস বানিয়ে তার কষ্টের শেষ করে।' অতঃপর 'স্বামী আর বেঁচে নেই বুঝতে পারলে সন্তানদের কথা মনে পড়লো।' সমস্ত জবানবন্দী শুনে জনতা সমবেত কণ্ঠে বলে, 'আমেনা, তুমি নিষ্পাপ।' চুয়ান্নোর সাধারণ নির্বাচনের সময় সাধারণ মানুষ যেমন ধর্মের নামে শোষিত হতে অস্বীকার করে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিল তেমনি এ নাটকে তাদের প্রতিনিধি জনতার কণ্ঠ যারা শোষণ ও নির্যাতনের শিকার তাদের পরিবর্তে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্যে আমেনার নির্দোষিতার ওপর প্রথম গুরুত্ব আরোপ করে। সেকারণে ভিখারিণী বলে, 'পাপ-পুণ্যের কথা নিয়ে আমেনা মাথা ঘামায় না। কার সাহস পাপ-পুণ্যের কথা তোলে তার সামনে ? কার সাহস তাকে জিজ্ঞেস করে কেন সে তার স্বামীকে বিষ দিয়েছে, কেন তার সন্তানের জান নিয়েছে ?'

অন্যদিকে এ নাটকের বিচারকও স্থিতাবস্থার রক্ষক হয়ে উঠতে যাচ্ছেন দেখে তাঁর বিবেক জাগ্রত রাখার জন্যে ভিখারিণী বলে, 'আমি ঝোপ-ঝাড়ের সাপ নই, পানি ঢোঁড়া সাপ নই। আমার বিষ-থলি কখনো শূন্য হয় না, ক্রোধও নিঃশেষ হয় না এই বিষ দিয়ে, এই ক্রোধ দিয়ে আমি তাকে রক্ষা করবো।' কিন্তু স্থিতাবস্থা রক্ষা না পেলে কিংবা তাকে বজায় রাখতে না পারলে সমাজের সেই স্বার্থ রক্ষা হয় না যার ফলে ও যার মধ্য দিয়ে বৃহৎ মানুষের সামগ্রিক স্বার্থের মূল্যে অন্যায় স্বার্থ প্রশ্রয় পায় ও বিকশিত হয়। 'গ্যালিলিওর জীবন' নাটকে ব্রেখ্‌ট তাই বলেছেন, 'ধর্মে অন্ধবিশ্বাস গৃহিণীর সংসারের অভাবকে ঠিকই ধরে রেখেছে।' এ নাটকে তাই দেখা যায় নতুন পোপ গ্যালিলিওকে বিজ্ঞানের বই লিখতে দিতে রাজী হয় শুধু এই শর্তে যে তার উপসংহার হবে, 'বিজ্ঞানে নয়, ধর্মে বিশ্বাসই চূড়ান্ত।' সেজন্যে ক্ষমতায় যারা আছে কিংবা না থেকেও তার ফল ভোগ করছে তারা চায় না সত্য প্রকাশিত হোক, এমনকি সে সত্য যদি দূরের নক্ষত্র সম্পর্কেও হয়। কারণ তা থেকে একদিন এই প্রশ্নও উঠতে পারে যে, সমাজে উঁচুনিচু ভেদাভেদের কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব যা ঘটা উচিত 'তরঙ্গভঙ্গে' তা 'ঘটতে' দেখা যায়, নেওলাপুরীর হাজতবাস ঘটে, আর বৈরী পরিবেশে সত্যিকার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়ে বিচারক করে আত্মহত্যা। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত শক্তি তো বিষয়টির এরকম সমাধান হতে দিতে পারে না। তাই অধ্যাত্মগুরু বারিশ পীর তার মুরিদ জজের কাছে ছুটে আসে নেহাতই বস্তুগত কারণে। কিন্তু বিচারক তখনো বিবেককে বিসর্জন দিতে পারেন নি বলে তাঁর পীরকে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, 'মুরীদানা থেকে বরখাস্ত দিয়ে কর্তব্য পালন করেছেন। এবার বাড়ি যান।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথার কাছে বিচারক হার স্বীকার না করে পারেন না। অন্তিম দৃশ্যে তিনি হয়ে যান পরিবর্তিত মানুষ, স্থিতাবস্থা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। ফলে আদালতে যেমন সমাজেও তেমনি ভুল স্বস্তি ফিরে আসে, স্থিতাবস্থা টিকে যায়।

আসলে মধ্যবিত্ত সমাজের একজন বিবেকী সদস্য হিসেবে প্রধানত প্রবাসে থেকেও সাতচল্লিশ-উত্তর বাংলাদেশে যে ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন ও নির্যাতন চলে আসছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাকে শুধু অনুভবই করেন নি, ওই ভূমিকায় নিজের ও তাঁর শ্রেণীর মানুষের ব্যর্থতা ও পলায়নী মনোবৃত্তিকেও শনাক্ত করেছিলেন। ফলে একজন সৎশিল্পী হিসেবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে শুধু চিত্রণই করেননি, এর বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদও উচ্চারণ করেছেন। যে-কোনো সচেতন পাঠক তাঁর রচনাবলী পড়ে এই প্রতিবাদ ও ঘৃণা অনুভব না করে পারবেন না। তাঁর নাট্যে ধৃত দ্বন্দ্ব এর এবং মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতার এক সৃজনশীল প্রকাশ। ৩৪

মধ্যবিত্ত সমাজের একজন বিবেকী সদস্য হিসেবে প্রধানত প্রবাসে থেকেও সাতচল্লিশ-উত্তর বাংলাদেশে যে ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন ও নির্যাতন চলে আসছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাকে শুধু অনুভবই করেন নি, ওই ভূমিকায় নিজের ও তাঁর শ্রেণীর মানুষের ব্যর্থতা ও পলায়নী মনোবৃত্তিকেও শনাক্ত করেছিলেন। ফলে একজন সৎশিল্পী হিসেবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে শুধু চিত্রণই করেননি, এর বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদও উচ্চারণ করেছেন।

দুধ

মশিউল আলম

সলিমুদ্দির বউ জুলেখা বাচ্চা বিয়োল বটে, কিন্তু মাস দুয়েক যেতে না যেতেই তার বুকের দুধ সব ফুরিয়ে গেল। বাচ্চাটা এখন কী খেয়ে বাঁচে? জুলেখার এই নিদারুণ প্রশ্নের জবাব নাই। আসমান-জমিনের মালিক জুলেখা ও তার শিশুটির এরকম বেকায়দা অবস্থা দেখে মুচকে হাসেন। আর তাতে ভীষণ রাগ হয় জুলেখার। আল্লা বড়ই খামখেয়ালী করে— এমন কথা তার বুকের মধ্যে বেজে চলে। এক সময় সে আসমানে তাকিয়ে বলেই ফেলে ; 'কামডা তুই ভাল করলু না খোদা।' কিন্তু জুলেখার বুকের ভিতরে নাকি আরো এক জুলেখার বাস। সে তর্জণী নাচিয়ে বলে : 'আল্লার কেরামতি বুঝবার চ্যাষ্টা করিস না।' তখন জুলেখার খুব আতঙ্ক বোধ হয়, নিজের বুকে থু থু ছিটিয়ে সে তওবা করে। কিন্তু তবু তার ভয়ানক পেটের পীড়া দেখা দেয়। হেগে-মুতে-বমি করে সে ঘর-বাড়ি-আঙ্গিনা ভাসিয়ে দেয়। তবে মধুপুরের লোকেরা জানে আসমান জমিনের মালিক অসীম দয়ালু আর অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি খাবার স্যালাইনের প্যাকেট হাতে ব্র্যাককর্মী আমিনুল ইসলামকে জুলেখার শয্যাপাশে পাঠিয়ে দিয়ে আজরাঈল ফেরেশতাকে ফিরে যেতে আদেশ করেন।

২.

জুলেখা বাদশার মেয়ে নয়। মধুপুর গ্রামের তালুকদারদের বাড়িতে সে বাঁধা কিষানী। তার স্বামী সলিমুদ্দিও তাই। বাঁধা গাই-বলদ আর বাঁধা কিষান-কিষানীতে তফাৎ নাই। জুলেখার বয়স ২৪। চামড়ার রঙ পুরাতন ছাতার কাপড়ের মতো কালো। শরীরে মাংসের আকাল। গিঁটসবস্ব কঞ্চির মতো চিকন, হ্যাঁকাব্যাঁকা ও দীর্ঘ তার শরীর। নাক হাড্ডিময় ও চোখা, চোয়াল উদ্যত। চোখ দুটি বড় বড়; তাদের তলদেশে ছায়াময় দুটি গর্ত আছে। সেগুলি কালো কালো দুটি ভাঙা চাঁদের মতো। জুলেখার বুক নারীদের বুকের মতো যথেষ্ট স্ফীত নয়। তার কোমর চ্যাপ্টা ও সরু। নিতম্ব দরিদ্র।

চিত্রাঙ্কন : নাজিব তারেক

শৈলী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর লেখকজীবনের প্রধান সময় ইউরোপে অতিবাহিত করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর লেখায় বাংলাদেশ ভাস্বর। তাঁর সাহিত্যসাধনা বিদেশ-বিভুঁইয়ে হয়ে থাকলেও তাঁর মনের শেকড় প্রাণশক্তি খুঁজে নিয়েছে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন থেকে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে একবারই আমার সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৫৪ সালে (৬ পুরানা পল্টনস্থ তাঁর সরকারি দপ্তরে)। তিনি ছিলেন প্রিয়দর্শন আলাপী মানুষ। কিন্তু কেন জানি না ঢাকায় তখন তাঁর পরিচিতমণ্ডলী বয়স্যদের মধ্যেই ছিলো সীমিত— কনিষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তেমন গড়ে ওঠেনি। এর একটি কারণ হতে পারে যে তিনি ঢাকায় কখনো একটানা বেশি দিন থাকেননি। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অল্প পরই দেখি তিনি ঢাকা ছেড়ে গেছেন। করাচি থেকে তাঁর চিঠি পাই।

আসলে দীর্ঘদিনের প্রবাস তাঁর মধ্যে একটা নির্মোক তৈরি করে দিয়েছিলো। সেই নির্মোক ছিন্ন হওয়ার পরই তাঁর ভিতরকার মিশুক শিল্পী মানুষটির সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যেতে হতো। আমি তাঁকে সেভাবেই পেয়েছিলাম। তাঁর একটা সম্মোহন-শক্তিও ছিলো, বাক্‌ভঙ্গি ঋজু এবং সুস্মিত।

একথা ঠিক যে শারীরিক আভিজাত্যের সঙ্গে মননের আভিজাত্যও তাঁর সমান সমান ছিলো। তিনি রূপদক্ষ শিল্পী। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে গৌরবিত করেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অধ্যয়ন ছিলো বিস্তৃত, তাঁর প্রেরণায় বিশ্ববিশ্রুত চিন্তাবিদদের সাক্ষাৎ অনিসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে বা অনুভবে ধরা পড়বে। সব সৎ ঔপন্যাসিকের মতো তিনিও ফর্মের পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিমগ্ন থেকে সঠিক ফর্মের অনুগত হয়ে তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। তাই পাঠককে শ্রম স্বীকার ক'রে অগ্রসর হতে হবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের ভুবনে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর লেখকজীবনের প্রধান সময় ইউরোপে অতিবাহিত করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর লেখায় বাংলাদেশ ভাস্বর। তাঁর সাহিত্যসাধনা বিদেশ-বিভুঁইয়ে হয়ে থাকলেও তাঁর মনের শেকড় প্রাণশক্তি খুঁজে নিয়েছে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন থেকে। তাঁর গল্প-উপন্যাসে চরিত্র-বিশ্লেষণ, সমাজসচেতনতা, শিল্পপ্রসাদ পরিণাহরূপে উপস্থিত যার দরুন তাঁর উপন্যাস শুধু পাঠককেই ভাবায় না, অন্যান্য লেখকদেরও ভাবায়। এই অর্থে তাঁকে লেখকদের লেখকও বলা চলে।

অনন্যসাধারণ দক্ষতায় তিনি আমাদের সাহিত্যপ্রপঞ্চের তন্দ্রা ভাঙিয়েছেন। তাঁর মতন স্বল্পসংখ্যক মননশীল লেখকেরাই জাতির মনন সঞ্চয়ের খাতা ভরে দেন। এঁদের বোঝার মতো শিক্ষা আর জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত করা চাই। এই ধারার লেখকদের রচনা শুধু সময় কাটানোর জন্য কিংবা দিবানিদ্রার আয়োজনে সহায়ক হয় না এটা মনে রাখতে হবে। পাঠকদের সজাগ ভূমিকা রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষিতশ্রেণীর সুচিন্তিত পাঠাভ্যাস ব্যতিরেকে সুস্থ সমাজ আশা করা দুরাশা মাত্র। চিন্তার যোগান দিতে পারে এমন বিষয় পাঠ করার অর্থই হলো সত্যিকার পাঠক হওয়া। সাধারণ্যে একটা কথা প্রায় উচ্চারিত হয় যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস বুঝে ওঠা বেশ কষ্টকর।

"সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো"— আমরা যদি এই উক্তি স্মরণে রেখে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাঠ করি তাহ'লে তাঁকে বুঝে উঠতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সাহিত্যে অমরত্বলাভ সহজ নয়। তিরোধানের পর লেখকের রচনা সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল বা আগ্রহ থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রত্যেক লেখকই সন্দিহান। সাহিত্যের বিশাল ভুবনে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করা খুবই কঠিন। কোনো লেখকই নিশ্চিত করে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন না। তবে সেই লেখকের জন্মই সার্থক, মৃত্যু যাঁকে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারে না। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেই সৌভাগ্যের অধিকারী মৃত্যুর সিকি শতাব্দী পেরিয়েও যিনি সমান আলোচিত এবং যাঁর উপস্থিতি প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয় বর্তমান লেখক, পাঠক ও সমালোচককে।

৩.

জুলেখার বুকে দুধ নাই। কিন্তু আল্লার রহমতে তার ছেলেটি দুধের অভাবে মরে নাই। বহাল তবিয়তে আছে সে; বড় হচ্ছে। গেরস্থ বাড়িতে ভাতের মার দুর্লভ নয়। তাছাড়া লোকেরা তাকে মাটির ঢেলাও খেতে দেখেছে। মানে, ভাতের মার ও মাটির ঢেলা খেয়ে জুলেখার ছেলেটা বড় হচ্ছে। এখন সে হামাগুড়ি দেয়; এটা-ওটা অবলম্বন করে দাঁড়াতেও পারে। তালুকদার বাড়ির উঠানে-বারান্দায়-চুলাপাড়ে-গোয়ালঘরে সে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কচি লালচে জিভটাকে সে তার সদ্যগজা দুইখানি দাঁতের পিছনে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ত ত ত ধ্বনি করে। মধুপুরে এমন কেউ নাই যে তাকে আদর করে কোলে তুলে নেবে, একটু দোলাবে, হাসাবে-কাঁদাবে। কিন্তু সেজন্য তার কিছু যায় আসে না। সে নিজ মনে থাকে, ভাতের মার ও মাটির ঢেলা খায়, হামাগুড়ি দিয়ে এখানে-ওখানে যায়, এটা-ওটা ছোঁয়, ভেড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলে, আর যখন-তখন খল খল করে হেসে ওঠে।

৪.

পৌষ মাসের এক বিষ্যুদবার রাতে মধুপুরের উত্তুরে পাঁথার বেয়ে শীতের বাতাস হি হি করে হেসে হিম দাঁতগুলি বের করে গোটা গ্রামটাকে কামড়ে ধরে। কালো আকাশ থেকে হিম শিশির ঝরে পড়ে টিন ও খড়ের চালে, গাছের পাতায়, খড়ের গাদায়, শুয়ে থাকা ধানক্ষেতে, ধুলির পথে ও শক্ত মাঠে। তালুকদার বাড়ির গোয়ালে গরুরা কাঁপে, ডাঁশ-মশা রক্ত খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকে। একসময় গাছের কোটর থেকে একটি পেঁচা বিদঘুটে মুখ বের করে কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরকে দেখে। তখন গ্রামের মসজিদে বুড়ো মুয়াজ্জিন কম্পিত স্বরে আজান দিয়ে ওঠে, আর তালুকদার বাড়ির অনেক গোয়ালের একটিতে একটি খড়ের গাদায় একটা লাল কুকুর তার বেঢপ পেটটা খালাস করে দিয়ে ৫টি বাচ্চাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। তখনও পুবের আকাশে সূর্যের কোনো আভাস নাই। তখনও তালুকদার বাড়ির বাইরের উঠানে টিন দিয়ে ছাওয়া টোলের মধ্যে রাশি রাশি খড়ের ভিতরে কালো কালো একদল মানুষ ফোঁস ফোঁস শব্দ করে ঘুমায়।

৫.

লাল কুকুরের ওলান দুধে ফেটে যায়। কিন্তু পেট তার ক্ষুধায় জ্বলে। বাচ্চারা এখনো চোখ মেলতে পারে না। পৃথিবীর আলো তাদের এখনো সহ্য হয় না। তারা কেবলি কুঁই কুঁই শব্দ করে একে অন্যের গায়ে ঢলাঢলি করে। মায়ের ওলানের বৃন্তও তারা নিজে থেকে খুঁজে পায় না। একসময় মা-কুকুর বেরিয়ে যায়। তার নিজের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন। খড়ভরা গোয়াল ছেড়ে, উঠান পেরিয়ে, পুকুরের ধার দিয়ে পাতাঝরা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে সে তার দুধভর্তি ওলান দোলাতে দোলাতে খাদ্যের সন্ধানে যায়।

৬.

গোয়ালের সামনে একটা দশাসই মর্দা কুকুর এসে দাঁড়ায়। ঝুলেপড়া কানদুটি তার খাড়া হয়ে ওঠে। নাকের ফুটো দুটি একবার সংকুচিত একবার প্রসারিত হয়। গোয়ালের ভিতরে অস্ফুট কুঁই কুঁই শব্দ। দশাসই মর্দা কুকুর শাঁৎ করে ঢুকে পড়ে। তেমনি তীরের মতো বেরিয়ে আসে। এবার দুপুরের কড়া রোদে তার মুখে কামড়ে ধরা একটা ধবধবে শাদা কুকুরছানা দেখা যায়। টপাটপ লাল রক্ত ঝরে পড়ে শুকনো মাটিতে। মাটি চোঁ করে শুষে নেয়, তবু দাগ মেশে না। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় মুখে বাচ্চাসমেত দশাসই মর্দা কুকুর। অতঃপর কিছুক্ষণ চারদিকে সুনসান নিরবতা। গোয়ালের অভ্যন্তরে শুধু অস্ফুট কুঁই কুঁই ধ্বনি। মধুপুরের তাবৎ মানুষ ধানকাটা-মাড়াই-সেদ্ধ-ভানা নিয়ে ভয়ানক মশগুল। এখানে এই গোয়ালের অভ্যন্তরে যা ঘটছে তার কোনো গুরুত্ব নাই। সুতরাং অল্প সময় পরে গোয়ালের সম্মুখে এক পাল রাক্ষুসে কুকুরের আবির্ভাব ঘটে এবং মুহূর্তে সেটি শূন্য হয়ে যায়। পৌষের শক্ত ও শাদা মাটিতে শুধু ফোঁটা ফোঁটা রক্তের বিভিন্নমুখী নকশা আঁকা হয়ে থাকে। শুকনো তৃষ্ণার্ত মাটি সব রক্ত চুষে নিয়েও সব চিহ্ন মুছে ফেলতে পারে না।

বাঁশঝাড়ে কুখাদ্য খেয়ে ফিরে আসে দুধেল কুকুর। কোথাও সময় নষ্ট না করে এসে প্রবেশ করে গোয়ালে। গোয়ালের ভিতরে খড়ের গাদা শূন্য দেখতে পেয়ে সে ছটফট করে ওঠে। চারটি পায়ের নখরে উলটপালট করে খড়। তারপর মাটি আঁচড়ায়, খড় বিচড়ায়, গোয়ালের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছুটাছুটি করে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে সামনের দুই পা তুলে দীর্ঘস্বরে উ উ উ শব্দ করে— মাটি আঁচড়ায়, গড়াগড়ি দেয়, হাঁপায়, আবার আকাশের দিকে সামনের দুই পা তুলে উ উ উ শব্দ করে কাঁদে আর কেঁদে চলে। মধুপুরের মানুষ এইসব দেখে না। সংসারে এর চেয়ে ঢের দরকারি কাজকর্ম রয়েছে তাদের।

৭.

জুলেখার ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে সারা বাড়ি উঠান খলা ঘুরে বেড়ায়। মধুপুরে ধান কাটা চলে। মাঠ ফাঁকা হতে থাকে। ধানে আর খড়ে ভরে ওঠে গেরস্থদের ঘর-বাড়ি-উঠান-গোলা। জুলেখা দিনে গোবরলেপা লাল উঠানে ধান শুকায়, ধানে পায়ের পাতা ডুবিয়ে ঘুরে ঘুরে 'পা দেয়'। বিকেলের লাল আলোয় বিছানো ধান 'পাউরা' দিয়ে টেনে টেনে স্তূপীকৃত করে। রাতে শিশিরে যেন না ভিজে যায় সে জন্যে সারের বস্তার পলিথিন আর চট দিয়ে ধানের স্তূপ ঢেকে রাখে। রাতে সে পাঁচমুখো চুলোয় বড় বড় পেতলের ডেকচিতে ধান সেদ্ধ করে। চুলোর ভেতরে ধানের কুড়ো ছিটিয়ে দেয়, পটপট শব্দ করে সেগুলি জ্বলে। সলিমুদ্দি আর সব কামলাদের নিয়ে দিনে ধান কাটে; ভারে করে আঁটিবাঁধা ধান নিয়ে আসে খলায়, পালা সাজায়, আর রাতে শূন্য ড্রাম আর কাঠের তক্তা বিছিয়ে ধান পেটায়, আঁটি থেকে ধান ছাড়ায়। জুলেখার ছেলে এইসব তুমুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে নিতান্ত অবহেলিতের মতো একা একা ঘুরে বেড়ায়। গোয়ালের সামনে বাচ্চাহারা একলা কুকুরটা একা একা বসে থাকে। তার দুই চোখে পানির দাগ। জুলেখার ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে যায়। তারা পরস্পর ভাব বিনিময় করে।

৮.

একদিন দুপুরে পাশের বাড়ির কাজের ছেলে আবদুলের চিৎকার শোনা যায়। লাফাতে লাফাতে নিজের দুই নিতম্বে চাপড় মারতে মারতে সে বলে বেড়ায় : 'কী তাজ্জব কথা বাহে, কী তাজ্জব কথা! জোলেখার ব্যাটা বুলে কুত্তার দুধ খায়!' লোকজন তার কথা শুনে হতবাক। যে যার হাতের কাজ ফেলে ছুটে চলে যায় বাইরের খলায়। সেখানে একটা খড়ের স্তূপের পাশে জুলেখার ছেলে ও বাচ্চাহারা কুকুরটার অনাবিল খেলাধুলা তারা দেখতে পায়। কিন্তু আবদুলের অভিযোগের সত্যতার কোনো ইংগিত তাদের আচরণে ফুটে ওঠে না। তখন একজন আবদুলের ঘাড়ে একটা থাপ্পড় মেরে বলে, 'শালা গোয়েন্দাগিরির জাগা পাস না ?' আবদুল মাটি ছুঁয়ে মায়ের কসম খায়, আল্লার কিরা খায় আর বলে, 'মুই লিজের চোখে দেখিছুঁ বাহে!' তখন আরো একটি থাপ্পড় তার দিকে উদ্যত হলে সে ভয়ানক বেজার হয়ে বলে, 'একদিন লিজের চোখেই দেখবার পাবিন মুই মিছা কথা কঁও নি।'

৯.

আর আবদুল পণ করে : আর কাউকে না হোক অন্তত জুলেখা ও সলিমুদ্দিকে একদিন সে এই অসম্ভব ঘটনা দেখাবেই। সেই থেকে সে তক্কে তক্কে থাকে; জুলেখার ছেলে ও কুকুরটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। সে লক্ষ্য করে, সকালে পান্তা খাবার পর কামলারা যখন ধান কাটতে মাঠে চলে যায়, কিষানী ও ঘর বাড়ির অন্যসব মানুষেরা বাড়ির কাজকর্মে ডুবে যায়, তখন জুলেখার ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আপন মনে ত ত ত শব্দ করতে করতে সবগুলি চৌকাঠ

ডিঙিয়ে বাইরের খলায় চলে যায়। সেখানে রাশি রাশি খড়ের স্তূপ ও গাদার গোলকধাঁধাময় টিপাগলির মধ্যে কুকুরটি ও জুলেখার ছেলে বিস্ময়করভাবে পরস্পরকে খুঁজে পায়। একদিন অবদুল হাতে-পায়ে ধরে জুলেখা, সলিমুদ্দি ও আরো কয়েকজন নারী পুরুষকে খলায় ডেকে আনে। একটা উঁচু খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে তারা দেখতে পায় : জুলেখার ছেলেটি খড়ের গালিচায় মচমচ শব্দ তুলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুধেল কুকুরটি তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে, খড় আঁচড়াচ্ছে, লেজ নাচাচ্ছে ও অদ্ভুত কুঁই কুঁই ধ্বনি করছে। জুলেখার ছেলে কুকুরটির গায়ে হাত বুলাতে চাইছে, তখন কুকুরটি ছল করে দূরে সরে যাচ্ছে; আবার একটু পরেই কাছে এসে লেজ নাচাচ্ছে। জুলেখার ছেলে খিলখিল করে হেসে উঠে আবার তাকে ধরতে চাইছে। আবার সে সরে যাচ্ছে। এইভাবে ছলচাতুরী খেলা চলে কিছুক্ষণ। তারপর একসময় কুকুরটি শান্ত হয়ে আসে, তখন সে জুলেখার ছেলেটিকে নিজের পেটের নিচে রেখে চারটি পা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। জুলেখার ছেলে তার ছোট্ট পা দুটি পাশাপাশি জড়ো করে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বসে, তারপর ঘাড় বাঁকা করে মুখ তোলে উপরের দিকে, এবং কুকুরটির দুধপূর্ণ ওলানের অনেকগুলি বৃন্তের একটিতে মুখ লাগায়। তৎক্ষণাৎ সলিমুদ্দি শাঁৎ করে বেরিয়ে আসে খড়ের গাদার আড়াল থেকে। কাঁধের কোদালটি দুহাতে শক্ত করে ধরে মাথার উপরে তুলে মেরুদণ্ড পিছনের দিকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে আঘাতে উদ্যত হয়। কুকুরটি টের পেয়ে দৌড় লাগায়, কিন্তু একটি খড়ের স্তূপের বাধা পেয়ে অন্যদিকে ঘুরে দৌড় দিতেই সলিমুদ্দির হা-করা মুখ থেকে হাক শব্দে বায়ু বেরিয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোদালের ধারালো দিকের উল্টো মোটা-সোটা ও ভারি ঘাড়টা গিয়ে পড়ে কুকুরটার মাথার ঠিক মাঝখানে। পাকা বেল ফাটার শব্দের অনুরূপ একটা শব্দ হয়, জুলেখার ছেলে ভয়ানক চিৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠে, আর কুকুরটা জিভে কামড় দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায়। সলিমুদ্দি সেসবের কিছুই দেখতে পায় না; সে শুধু দেখতে পায় তার মাথার চারপাশে লক্ষ লক্ষ জোনাকি দুপুরের রোদেও অসম্ভব ঝলকানি দিয়ে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে। সবাই যখন কুকুরটির অন্তিম দেহ সঞ্চালনের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে, তখন সলিমুদ্দির হাত থেকে কোদালটি নিঃশব্দে খসে পড়ে খড়ের ওপর; আর মাথার চারপাশে বৈরী জোনাকিদের ঝলকানিসহ চক্কর মারা এক মুহূর্ত দেখার পরই তার চোখ দুটি আস্তে বুঁজে আসে এবং মৃদু একটা টাল খেয়ে তার শরীরটা আলগা হয়ে যেতেই কামলাদের নজর পড়ে তার দিকে। গোড়াকাটা কলাগাছের মতো সলিমুদ্দির দেহটা পড়ে যাচ্ছে— এই অবস্থায় তাকে ধরে ফেলা হয়। জুলেখা তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠলে পুকুর পাড়ের আমগাছে তিনটি কাক সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয় এবং জুলেখার ছেলেটি কান্না ভুলে অবাক চোখে কাকেদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

১০.

সলিমুদ্দির মাথায় পৌষের পুকুরের ঠাণ্ডা পানি ঢালা হয়। তার হুঁশ ফিরে আসে। প্রথমে সে অবাক হয়ে আকাশে তাকায়, গাছপালার শাখাপ্রশাখা দেখে। তারপর তাকে স্বাভাবিক মনে হয়। আরো ঘণ্টাখানিক শুয়ে আরাম করার পর সে রীতিমতো সুস্থ হয়ে দিনের কাজে ফিরে যায়। এক খামচি সরষের তেল মাথায় ফেলে ডান হাতের তালুতে মাথা ঘষতে ঘষতে লুংগি-গামছা কাঁধে নিয়ে দিব্যি হেঁটে গিয়ে পুকুরে 'ডুব'

দিয়ে আসে। তারপর দক্ষিণে ঢলে পড়া শীতের সূর্যের মিঠা রোদে পিঠ বাগিয়ে দিয়ে উঠানে অন্য কামলাদের সঙ্গে বসে পেট ভরে ভাত খায় এবং খাওয়া শেষে প্রতিদিনের মতো ঢকঢক করে অনেকগুলি পানি পান করে পেটটাকে শক্ত তরমুজের মতো বানিয়ে বিড়ি ধরিয়ে সুখে টান দিতে দিতে গল্প করে। দুপুরের খাওয়ার পর জিরোবার এই সামান্য সময়টুকু ফুরিয়ে গেলে সলিমুদ্দি ঠিকঠাক আর সব কামলার মতো মাঠে যায় ধান কাটতে।

১১.

তারপর শীতের সূর্য ক্লান্ত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে দ্রুত। সোনালি মাঠে কিষানদের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে একসময় ফিকে হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। শুকনো খড় ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে শিশিরে আর উত্তরের প্রান্ত থেকে শীত তার দাঁত বার করে হি হি করে হাসতে হাসতে এসে মানুষের চামড়া-হাড্ডি কামড়ে ধরেছে। শীতের ভয়ে প্রান্তর ও লোকালয় সহসাই চুপ মেরে গেছে। গ্রামের মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বনি শীতের আকাশে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেছে। কিষানেরা ধান নিয়ে ফিরে গেছে ঘরে। এই ঘর তাদের নিজেদের নয় ; এই ধানও নয় তাদের। রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জের এইসব কালো কালো মানুষ প্রতি বছর ধান কাটার মৌসুমে এ অঞ্চলে কাজের খোঁজে আসে। গেরস্থদের মাঠে তারা ধান কাটে, গেরস্থদের উঠানে টিনছাওয়া টোলের মধ্যে খড় বিছিয়ে ঘুমায়, ধবধবে শাদা ভাত খায় সবুজ লংকা দিয়ে, ধান কাটে, ধান মাড়াই করে। চাঁদের আলোয় অথবা ঘোরকৃষ্ণ অমাবস্যায় তারা শিশিরে ভিজতে ভিজতে ধান মাড়াই করে আর গান গায়।

১২.

কিষানেরা এখন উঠানে সারি বেঁধে বসে ভাত খায়। গামলা গামলা শাদা ভাত তারা খায়, কেবলই খায়। তাদের খাওয়া যেন শেষ হতে চায় না। তারা বুঝি খুশি হয় এভাবে অনন্তকাল ভাত খাওয়া চলতে থাকলে, তারা থামতে চায় না, শুধু খেতে চায়, আরো খেতে চায়। কালো আকাশ হতে শিশির ঝরে পড়ে তাদের মাথায়। কিষানেরা কদাচিৎ আকাশের কথা ভাবে, আকাশকে তারা আসমান বলে। ঝড় বৃষ্টির খোঁজ-খবর নিতেই সাধারণত তারা আসমান পানে চায়। আর খুব কদাচিৎ অন্য অর্থে আসমানের কথা ভাবে, যে সেখানে দুজাহানের মালিকের আরশ হয়, যে তিনি অসীম মেহেরবান হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো অসম্ভব গজব নাজিল করেন, যে তাঁর কেরামতি বোঝা মানুষের সাধ্য নয়।

কিষানেরা ভাত খেয়ে এবং পানি খেয়ে এবং তামাকের ধোঁয়া খেয়ে তাদের পেটগুলি তরমুজের মতো বানায়, আহ্ ধ্বনি করে তৃপ্তি জানায়, আর বসে বসে গল্প করে। তারপর কানে-মাথায় গামছা বেঁধে শূন্য ড্রাম আর কাঠের তক্তা বিছিয়ে ঠ্যাস ঠ্যাস থপাস থপাস থিপিস থিপিস শব্দে ধানের আঁটিগুলি পেটাতে থাকে। এইভাবে রাত আরো গভীর হয়ে আসে। গাঢ় হয়ে শিশির জমে ওঠে টিনের চালে, খড়ের গাদায়, বাঁশের ঝাড়ে, গাছের পাতায়। পেঁচা ডাকে, দূর থেকে শেয়ালের হুক্কা হুয়া ভেসে আসে, গলির মোড়ে কুকুর কেঁদে ওঠে।

এক সময় পাঁচমুখী চুলার পাড় থেকে জুলেখারও উঠে আসার সময় হয়। ধানের কুঁড়ো তখনও চুলোর ভিতরে ডিমের কুসুমের রঙ নিয়ে ধিকি ধিকি জ্বলে। সলিমুদ্দি তার সঙ্গীদের কাছ থেকে নিজের ঘরে চলে আসে। এ বাড়ির সংবৎসরের বাঁধা কিষান হিসেবে তার ও তার পরিবারের জন্য একটা আলাদা ঘর আছে। সে ঘরে চৌকি নেই বটে তবে খেজুর পাতার বিছানা আছে, আর এখন অঢেল খড়ের গদি বানিয়ে তার উপর সেই বিছানা বিছানোতে মনে হয় বেশ উষ্ণ আর স্প্রিং করা গদি আছে তাদের। সেই গদিতে জুলেখা-সলিমুদ্দির ছেলেটা সন্ধ্যা থেকে ঘুমাচ্ছে। কাজকর্ম সেরে সলিমুদ্দি ও জুলেখা ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

তারপরে আকাশে চাঁদ ওঠে। চাঁদের আলোয় রহস্যময় হয়ে ওঠে চরাচর। এক রহস্যময় নির্মম জীব চারদিকে হিম ছড়াতে থাকে। মধুপুরের কোথাও কোনো শব্দ নেই, পেঁচা ডাকছে না, শেয়ালের হুক্কাহুয়া নেই, কুকুরের আর্তনাদও নেই। শুধু সীমাহীন নৈঃশব্দে গম্ভীর শীতের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে আছে মধুপুর।

১৩.

শেষ রাতে সমস্বরে সোরগোল করে জেগে ওঠে মধুপুরের মানুষ। চন্দ্রালোকিত চরাচর দূরাগত এক গম্ভীর শব্দে নড়ে ওঠে। মধুপুরের মানুষ নিজ নিজ ঘর দুয়ার বারান্দা উঠান খলায় দাঁড়িয়ে এক সর্বব্যাপী ঢল দেখতে পায়। চারদিকের আধফাঁকা প্রান্তর ছাপিয়ে বেড়ে ওঠে ঢল, দেখতে দেখতে বাঁশঝাড়, পুকুর ঘাট, অলি-গলি ডুবিয়ে বেড়ে ওঠে ঢলের তরল। গেরস্থের খলা উঠান ছাপিয়ে সে তরল ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতরে। লোকেরা তখন খড়ের গাদা, ধানের পালা আর ঘরের চালে উঠে যেতে থাকে। তারা দেখতে পায় দুধের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দুনিয়া। চাঁদের ধবল আলোয় আর দুধবন্যায় প্লাবিত হচ্ছে চরাচর। তারা বিস্ময়ে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করে আর আসমান-জমিনের মালিকের গূঢ় কেরামতি বুঝবার জন্য বুকের ভিতরে এক করুণ বাসনা বোধ করে। কিন্তু সে বাসনাকে তারা প্রশ্রয় দিতে চায় না, তাদের শংকা বোধ হয়। তারা ঘরের চালে, ধানের পালা বা খড়ের গাদার শীর্ষবিন্দুতে অথবা গাছের মগডালে দাঁড়িয়ে চতুষ্পার্শ্বে তাকায়, তাদের কেউ কেউ মনে মনে সলিমুদ্দিকে খোঁজে, তার ছেলেটির কথা তাদের মনে পড়ে এবং তাকে দেখবার জন্য তাদের ঔৎসুক্য বোধ হয়। তখন অকস্মাৎ তারা এক অশ্রুতপূর্ব হাসির শব্দ শুনতে পায়। দুধপ্লাবিত নিঃশব্দ চরাচরে একটি শিশুর খিলখিল হাসি এমনভাবে ধ্বনিত, এবং সহস্রবার প্রতিধ্বনিত হতে শোনে যা তাদের সকল পূর্বাভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যায়; অতঃপর তারা দেখতে পায় : বাঁশঝাড় ভেসে যাচ্ছে দুধের বন্যায়, ভেসে যাচ্ছে চাঁদের বন্যায়; ধুমায়িত দুধ আর ধুমায়িত জ্যোৎস্না উঠে যাচ্ছে আসমানের দিকে, এই অদৃশ্যপূর্ব ধবল ছবিতে, দুধের আর জ্যোৎস্নার প্লাবনে সলিমুদ্দির ছেলেটিকে মহাউল্লাসে সাঁতরাতে দেখে, তার পাশে স্ফীত ওলানের লাল কুকুরটাকে রাজরানীর মতো সুখে গা ভাসিয়ে দুধের ঢেউয়ে দুলতে দেখে মধুপুরের সকল মানুষ স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তারা বয়স, স্বভাব এবং প্রকৃতিবিশেষে উন্মাদ, কমবখ্‌ত ও নির্বোধ হয়ে যায়।

পুনশ্চ : উত্তরবঙ্গের জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি থানার মধুপুর গ্রামের ৭০ শতাংশ মানুষ এখনও নানা রকম মানসিক অসুখের শিকার। কেউ বদ্ধ উন্মাদ, কেউ গোড়া থেকেই মানসিক প্রতিবন্ধী, কেউ বা অতিমাত্রায় বোকাটে ধরনের। মধুপুরে কুকুর বলে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, লোকেরা অন্য গ্রাম থেকে কুকুরের বাচ্চা ধরে এনে পোষার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে; কোনো কুকুর সেখানে বাঁচে না। মধুপুরে স্তন্যপায়ী কোনো প্রাণীর স্তনে দুধ হয় না; গরু ছাগল বা ভেড়ার বংশবৃদ্ধি সেখানে ঘটে না। লোকেরা বয়স্ক বলদ দূরের হাট থেকে কিনে এনে চাষাবাদের কাজে লাগায়। মধুপুরে মেয়েরা গর্ভবতী অবশ্য হয়, তারা সন্তানও প্রসব করে, কিন্তু তাদের বুকে কখনো দুধ আসে না। বড় গেরস্থের শিশুরা কৌটার দুধ খেয়ে বড় হয়, গরিবের ছেলেমেয়েরা ভাতের মার ও মাটির ঢেলা খায়। তাদের অধিকাংশই হাঁটতে শেখার আগে মরে যায়, যারা বেঁচে থাকে তারা কিম্ভূতকিমাকার চেহারা ও শরীর নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা ঠিক বড় হয় না, তাদের শরীরে হাড় মাংস পানি রক্ত ইত্যাদি মিলে একটা ঘোট পাকায়, ফলে তারা দেখতে অদ্ভুত রকমের : হুবহু এরকম চেহারা ও আকৃতির মানুষ পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে নেই। ৩৪

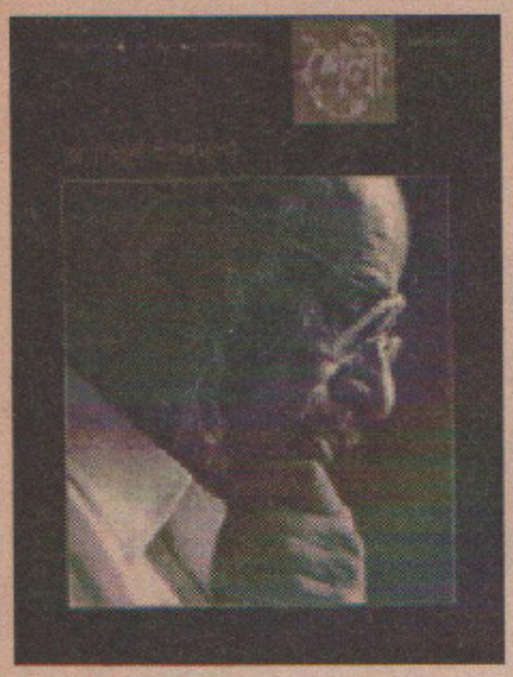

শৈলীকে অভিনন্দন

'শৈলী' আসলে কি ? নিউজপ্রিন্টে ক্ষুদে, মলিন অক্ষরে ছাপা দৈনিকের সাপ্তাহিক সাহিত্যপাতা সে যেমন নয়, তেমনি শ্রদ্ধাশ্রয়ী, নিরীক্ষাধর্মী লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনও সে নয়। তবু, 'মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা!' – বলেছেন ভগবান অমিতাভ। অমিতাভের সে শিক্ষা রক্তে বহন করে, আমরা বাঙালিরা, আজো যে কতটা মধ্যপন্থী জাতি, 'শৈলী'র বর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তা সে সাক্ষ্যই দেয়। সন্দেহ নেই, এ মধ্যপন্থী চারিত্র্যের কারণে শুধুমাত্র 'শৈলী'র পক্ষেই সম্ভব হলো 'অ্যালেন গীন্সবার্গ' ও 'আষাঢ়ে গল্পের' মতো সম্পূর্ণ পৃথক বর্গক্ষেত্রের দুটো বিষয় নিয়ে পরপর দুটি প্রচ্ছদ করা।

'শৈলী' তার ১ জুন, ১৯৯৭ পাক্ষিকে প্রকাশ করেছে 'অ্যালেন গীন্সবার্গ' সংখ্যা। ব্যক্তিগতভাবে, অ্যালেন গীন্সবার্গকে নিয়ে বঙ্গদেশে স্তুতির যে মত্ততা দীর্ঘদিন ধরে চলছে, আমি তার ঘোর বিরোধী। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর অবদানের প্রতি আকুল শ্রদ্ধাসহকারেই বলতে হচ্ছে যে, সর্বতোভাবেই, গীন্সবার্গকে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক কবির বেশি মর্যাদা দেয়া যায় না। তাঁর হিপিপনা, গঞ্জিকা সেবন বা সমকামিতা, তথাকথিত বীট-বিদ্রোহের যাবৎ উন্মার্গ প্রকাশ, শেষপর্যন্ত, নয়া কনজিউমারবাদী GMF ও পেন্টাগন শাসকশ্রেণীর 'কোলে করা খোকাদের ড্রয়িং রুম বিদ্রোহে'র চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠতে পেরেছে কি ? রাজামশায়, ছেড়ে বড় দুষ্টু। দুধ-ভাত খেতে চায় না! ঠিক আছে, চাইছে যখন, গাঁজাই দাও! ছেলে ঘুমোক, পাড়া জুড়োক...। বস্তুত কয়েক শতাব্দীর মারী-মড়ক, ইনকুইজিশন, ক্রুসেড, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, শিল্পবিপ্লব ও দু দুটো মহাযুদ্ধের দূরপথ পাড়ি দেওয়ার কারণে ক্লান্ত যে শ্বেতাঙ্গসভ্যতা প্রগতি, বিপ্লব ও ইডেন রচনার রেনেসাঁ-স্বপ্নে ক্লান্ত হয়ে মাদক ও মাদক, ক্লৈব্য ও ক্রমাগত ক্লৈব্যের আচ্ছন্নতায় ঘুমোতে চেয়েছে, অ্যালেন গীন্সবার্গদের তথাকথিত বীট বিদ্রোহ সেই ক্লান্ত ও পরাস্ত মানুষদেরই আলেখ্য, আর কিছু নয়। আর, পঞ্চাশের দশক থেকেই পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার নব্য শাসকশ্রেণীও চাইছিলেন তাই। মার্কসবাদের বদলে নিও মার্কসবাদ, সামাজিক মিথোপযোগিতার (Symbioses) বদলে সমাজতত্ত্বকে নিছক একাডেমিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা... এসবেও কাজ না হলে সম্ভাবনাময় তারুণ্য বিভোর থাকুক যৌনাচার আর তিব্বতি মন্ত্রের ককটেলে। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আবরণে প্রতিষ্ঠানের পরিতোষের চেয়ে বেশি আর কোন্ উপায়ে সাধিত হতো ? ব্যক্তি গীন্সবার্গের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, শেষ পর্যন্ত ঘটনা ঘটেছিল এই-ই। তবু, আমরা বাঙালিরা, যেহেতু ইংরেজি কয়েক পাতা 'লিখিতে-পড়িতে' শিখলেই শ্বেতাঙ্গদের কুলজি-ঠিকুজি নিয়ে লিখতে বসি, সেহেতু অ্যালেন গীন্সবার্গকে নিয়ে রচনা ও তাঁর কবিতা অনুবাদে নিবিষ্ট হয়েছেন দেশের বিশিষ্ট ও সদাশ্রুত কবি ও সমালোচকগণ। হায়, 'আকাশের দেবতা হারু ঘোষের দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্য করিলেন'– এ লাইনটা ইংরেজিতে কোন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি অনুবাদ করে না কেন ?

যাহোক, তিক্ততা ঢের প্রকাশ হলো। এবার আসা যাক সংখ্যাটির মূল্যায়নে। গীন্সবার্গকে নিয়ে পাঁচটি রচনার মধ্যে তথ্যের হুড়োহুড়ি নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্ন সরলতা লক্ষ্য করা গেছে আবু কায়সারের 'ক্ষমা করো এ-দীনতা'র শেষাংশে। জাকারিয়া শিরাজীর লেখাটি গীন্সবার্গকে পুরোপুরি জানার জন্য জরুরী ছিল। জরুরীতর ছিল সাযযাদ কাদিরের জুড়ে দেওয়া 'গীন্সবার্গের জীবনপঞ্জি'। কবিতার অনুবাদ নিয়ে কিছু বলার নেই, কারণ গীন্সবার্গের 'কবিতা' কতটুকু কবিতা সে বিষয়ে আমি সংশয় পোষণ করি।

২ আষাঢ় সংখ্যায়, ধন্যবাদ শৈলী, 'কদম্ব-কেতকীর' বদলে আষাঢ়ে গল্পের মাধ্যমে আষাঢ়কে সনাক্ত করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। বহুদিন পর শৈশবের মতো নিখাদ বিস্ময়ভরা হাসি হাসা গেল সুমন্ত আসলামের আষাঢ়ে গল্পটির কল্যাণে। শহীদ আখন্দ গল্পে ভৌতিক ছায়া আনতে চেষ্টা করেছেন, মন্দ নয়। বেশ ত গা ছমছম করল। শামসুর রাহমান, মমতাজউদদীন আহমদ ও মাকিদ হায়দার সম্ভবত অতি লিখে ক্লান্ত। তাঁদের লেখাগুলো তাই নিছক ফরমায়েশি বা অনুরোধ রক্ষার দায়ে লেখা বলে মনে হয়েছে।

আষাঢ়ে গল্প– বাংলার চৈত্র রাতে ফটিক জ্যোৎস্নার মতই বাঙালির অরূপ সম্পদ। ফ্রান্সে যেমন Drok Stories, ইতালীর Gesta Romanorum, জার্মানীর Horror Stories, বাংলা গল্পের তেমনি ষোলআনা খাঁটি প্রকরণ হলো আষাঢ়ে গল্প। 'আষাঢ়ে গল্প' প্রসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের fantasy tales-এর বিশ্লেষণ, কথাসরিৎ সাগর কি আলিফ লায়লা, ওয়া লায়লা থেকে শুরু করে বোকাচ্চিওর 'ডেকামেরন', চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেলস' হয়ে ... অসুবিধে কি থামত যদি ত্রৈলোক্যনাথ বা পরশুরামে এসে? তবে, 'শৈলী' আষাঢ় সংখ্যার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে কবি আল মাহমুদের 'খনার বর্ণনা : সনেট পঞ্চক।' ঠিক আষাঢ়ের লোকজ বাংলাই তার তীব্র শরীর, তীব্র ঘ্রাণ নিয়ে উপস্থিত। হ্যাঁ, একমাত্র এমন কবিতার পক্ষেই সম্ভব আদার শিকড়-হলুদ-ধান-কাউনের শরীরে সংস্থিত, চিরায়ত বাংলার প্রতি স্পর্ধী নারীর ও সেই নারীত্বের অন্তর্দীপন ও অন্তর্বৃতি (inner circle)-কে তির্যকভাবে বয়ান করে পুরুষতান্ত্রিক শাস্ত্রীয় hierarchy-র বিরুদ্ধে স্রোত তৈরি করা।

সবশেষে, বর্হেসের সেই বিখ্যাত উক্তি ('অথবা শোপেনহাওয়ারের দর্শন এবং ইংল্যান্ডের শব্দসঙ্গীতের চেয়ে কম স্মরণীয় ঘটনাই ঘটেছে') সামান্য বদল করে বলা যায়, মহাজগতে নক্ষত্রমণ্ডলী, দেশান্তরী পাখিদের উড্ডীনপথের চেয়ে কম স্মরণীয় ঘটনাই ঘটেছে। 'শৈলী' কেন প্রকাশ করবে না সেসব বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা।

অদিতি ফাল্গুনী
ঢাকা-১২০৫।

কৈফিয়ত চাই

এখানে আমি 'শৈলী'র 'নজরুলের গান' সংখ্যার দুজন স্বেচ্ছাচারী (আমার এবং শ্রদ্ধেয় সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের ভাষায়) কবির কথা বলবো। তাঁদের একজন হলেন ব্রাত্য রাইসু, অন্যজন আবু হাসান শাহরিয়ার। ব্রাত্য রাইসু তাঁর 'স্টাররা আমাকে চিনে' কবিতায় শেষ লাইনে লিখেছেন, 'Star তাকে চিনিতে প্যারেছে।' এই 'প্যারেছে' শব্দটিই আমাকে আতঙ্কিত এবং ক্ষুব্দ করেছে। তিনি 'পেরেছে'কে কেন যে 'প্যারেছে' লিখলেন বুঝতে পারছি না। ব্যাকরণের নিয়ম না মেনে তিনি

এখানে নিজের 'কবিত্ব' আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেন এই 'কবিত্ব' আরোপ ? আমরা জানি নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখ কবিরা কোন কোন লেখায় শব্দের উপর বিশেষত্ব আরোপ করেছেন এবং সেগুলো ছিল যথার্থ। ব্রাত্য রাইসু কি তাঁদের মতো 'বিশেষ ব্যক্তিত্ব' হতে চান ? তাই বলে এভাবে ব্যাকরণের নিয়ম ভেঙে আর বানানের বিকৃতি ঘটিয়ে?

আবু হাসান শাহরিয়ারের 'পদ্য লেখার গদ্য' নিবন্ধটি হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। তবে সে ছুঁয়ে যাওয়ার মধ্যে শুধু ঘোর লাগা সুখই ছিল না, কয়েক পার্সেন্ট শূল বেদনাও ছিল। খুবই মর্মাহত হয়েছি তাঁর লেখার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় ছয়টি 'দ্যাখা' পড়ে। কেন তিনি ' দেখা'কে 'দ্যাখা' লিখলেন? নূতন ব্যাকরণীয় রীতি চালু করতে চান নাকি ? বিখ্যাত কোন কোন লেখকের লেখায় 'দ্যাখা' জাতীয় শব্দ-বানানটি দেখেছি। কিন্তু সেটা ছিল যথার্থ প্রয়োগ। যেমন শহরের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গ্রামের কোন ভণ্ড মাতবর নিরীহ কোন প্রতিবেশীর বেয়াদবির প্রতিবাদ করে চাপা গলায় ক্ষুব্দ মনে যখন স্বরের উপর জোর দিয়ে বলে, 'দেখব তোকে', সেই 'দেখ্‌ব'কে ভাবের সঠিক প্রকাশরূপে 'দ্যাখ্‌ব' লেখা যায়। এরূপ স্থানে 'দ্যাখা' ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু আবু হাসান শাহরিয়ার সাহেব অকারণে এতগুলি স্থানে 'দেখা'কে 'দ্যাখা' লিখলেন কেন ? বলবেন কি ?

আসলে স্বেচ্ছাচারী এবং মূর্খ (সাহিত্য যাঁরা পড়েন না, সাহিত্য নিয়ে ভাবেন না; কিন্তু জনপ্রিয় ব্যক্তি হওয়ার কারণে উপন্যাস লিখে ফেলেন) লেখকদের (যাঁরা লেখেন, এই অর্থে) কারণে দিন দিনই আমাদের ভাষা নিজস্ব স্বকীয়তা হারাচ্ছে। মূর্খ লেখক-লেখিকারা টাকার জোরে বিকৃত বানানের বস্তাপচা লেখাগুলো আমাদের সামনে এনে ফেলছেন আর আমরা সস্তা পাঠকরা সেগুলো গো-গ্রাসে গিলছি। না গিলার কি আছে ? অন্য মাধ্যমে ওনারা এত জনপ্রিয়, এত পারঙ্গম; এই মাধ্যমে না পারার কি আছে ? আবার পত্র-পত্রিকায় দেখি এঁদের বইয়ের কি রোমাঞ্চকর সমালোচনা! অতএব গিলছি আমরা সবাই। শেখড় হারাতে শুরু করেছে বিশ্বসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা। অনাগত ভবিষ্যতে আমাদেরই হাতে তার পুরো শেখড় কাটা পড়বে। আর স্বেচ্ছাচারীদের কথা কি বলবো ? তাঁরা একটু যদি উঁকি দিতে পারেন তবেই হয়েছে। নিজেদের ভেবে বসেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিদের চেয়েও বড় কেউ। 'ওনারা কি নিয়ম দিয়ে গেছেন ? এসব নিয়ম-ফিয়ম আমরা মানি না'– এই হচ্ছে এখনকার উঁকি মারা লেখিয়েদের নিগূঢ় মন্ত্রণা। এঁরা তাই অনায়াসে অকারণে 'পেরেছে'কে 'প্যারেছে' এবং 'দেখা'কে 'দ্যাখা' লিখে ফেলতে পারেন। সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের ভাষায়, 'কারো কারো যথেচ্ছাচার তো আছেই– ওরা লেখেন, গ্যালো, গ্যাছে, ক্যামন, য্যামন ইত্যাদি ('ভাষাসংখ্যা' এবং ব্যক্তিগত কিছু ধ্বনি; শৈলী, 'নজরুলের গান' সংখ্যা)

শঙ্কিত হই এই ভেবে যে এঁদের এই বিকৃত এবং ভুল বানানই হয়তো কালের বিবর্তনে অনাগত ভবিষ্যতে সাহিত্যে স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসবে। তখনকার সেই ভাষাকে কি বাংলা ভাষা বলা যাবে ? এভাবেই কি মূল বাংলা ভাষা একদিন হারিয়ে যাবে না ? পরিশেষে 'শৈলী'র কাছে প্রশ্ন, সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের বানান সম্পর্কিত লেখাটি পড়ার পরও কেন ঐ দুটো লেখা ছাপা হলো ? কোন পাত্তাই দিচ্ছে না বিষয়টিকে ? বিষয়টি তেমন কিছু নয় ? ওনারা বিখ্যাত বলে ? কিন্তু সত্যানুসন্ধানী এবং প্রকৃত সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে 'শৈলী'র কাছে আমরা সেটা আশা করি না। সাহিত্য পত্রিকা যখন, সাহিত্যের কল্যাণ সাধনই হবে তার প্রধান কাজ। আর কল্যাণ সাধন করতে হলে এই ধরনের লেখা এবং লেখকদের (যাঁরা লেখেন) ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং পাঠকদেরকে সতর্ক করতে হবে। আরেকটা অনুরোধ, যাঁরা এ ধরনের বিকৃত বানানের বই লেখেন, তাঁদের লেখা এবং তাঁদের সম্পর্কে সমালোচনা লিখে ভাষার উপর 'অশনি সংকেতের' থাবা রুখতে পাঠককে সাবধান করবেন। পাঠকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা ভাষার মৌলিকতার স্বার্থে এ ধরনের লেখা এবং লেখককে বর্জন করবেন এবং তাঁদের লেখার বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।

আরেকটা কথা, আমার এ লেখায় যদি কোন ভুল থাকে সেটা স্লিপ অব রাইটিং এবং অনিচ্ছাকৃত। এর জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

মোশারফ হোসেন খান
নিউ হোস্টেল, লাকসাম রোড
কুমিল্লা।

অ্যালেন গীন্সবার্গ

'শৈলী' ১ জুন সংখ্যাটি পড়ে আনন্দিত হলাম। আমেরিকার বিখ্যাত কবি অ্যালেন গীন্সবার্গকে নিয়ে বেশ কয়েকটি রচনা আর তরজমা করা ৫টি কবিতা পড়লাম। সবগুলি লেখা আমার খুব ভালো লেগেছে। আরো ভালো লাগতো আমাদের মহান স্বাধীনতাকে নিয়ে লেখা কবি অ্যালেন গীন্সবার্গ-এর 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটির যদি অনুবাদ থাকতো। কারণ 'শৈলী'র মতো একটি সাহিত্য ম্যাগাজিনে এই লেখাটি না থাকায় সংখ্যাটি অপূর্ণ থেকেছে অনেকাংশে।

পরবর্তী সংখ্যায় 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করতে 'শৈলী'র যেন কোন ভুল না হয়। কারণ এই কবিতাটি আমাদের স্বাধীনতার একটি ইতিহাস।

জাহিদুর রহমান উজ্জ্বল
সাধারণ সম্পাদক
মাদারগঞ্জ প্রেসক্লাব
জামালপুর।

শৈলী পাঠচক্র

দেশের বিভিন্ন স্থানে 'শৈলী পাঠচক্র' গঠনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। একজন আহ্বায়কসহ কমপক্ষে ৭ জন পাঠক নিয়ে এ ধরনের 'পাঠচক্র' গঠিত হবে। শৈলী পাঠচক্রের সদস্যরা কমপক্ষে এক বছরের জন্যে শৈলীর গ্রাহক হলে তাঁদের বার্ষিক চাঁদা ধার্য চাঁদা থেকে শতকরা ২৫ ভাগ কম হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা
'শৈলী পাঠচক্র'
প্রযত্নে : সম্পাদক
শৈলী
রহমান ম্যানশন (৪র্থ তলা)
১৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ভ্রম-সংশোধন

[বর্ষ ৩ সংখ্যা ১১, ১৬ জুলাই ১৯৯৭ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে নাইম হাসান লিখিত পত্রের সর্বশেষ 'Pretentions criticism' এর স্থলে 'Pretentious criticism' পড়তে হবে। এই ত্রুটির জন্য আমরা পত্রকার ও পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। - সম্পাদক]

ঔপন্যাসিকের বিবেক : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

শিবনারায়ণ রায়

[শিবনারায়ণ রায় বাংলা ভাষার একজন মনীষাদীপ্ত লেখক। তিনি বিশ্বের যুক্তিবাদী লেকদের অন্যতম। তাঁর রচনার বিষয়বৈচিত্র্য যে-কোনো মননশীল পাঠককে আগ্রহী করে তোলে। ভাষা ও বিষয় দুই মিলে পাঠকের কাছে দুর্মর আকর্ষণ তাঁর রচনাবলী। তাঁর রচনার সংস্পর্শে এসে পাঠকমাত্রেই আধুনিক হয়ে ওঠেন।

শিবনারায়ণ রায়ের লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন– "... Sibnarayan Ray stands for a point of view which I consider important in every part of the world. ... His writing ably represents a more reasonable point of view than that of most writers of our time."

তাঁর প্রথম বই 'প্রেক্ষিত' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। তাঁর এই বইটি ১৯৫২ সালে আমি সংগ্রহ করি পরম শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু-কে চিঠি লিখে। বসু মহাশয় পাঠক মাত্রেরই তৃষ্ণা মেটাতে সাহায্যে কার্পণ্য করেননি। শ্রী রায় প্রথম জীবনে ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন বেশি। আমাকে লেখা তাঁর এই চিঠি তার প্রমাণ।

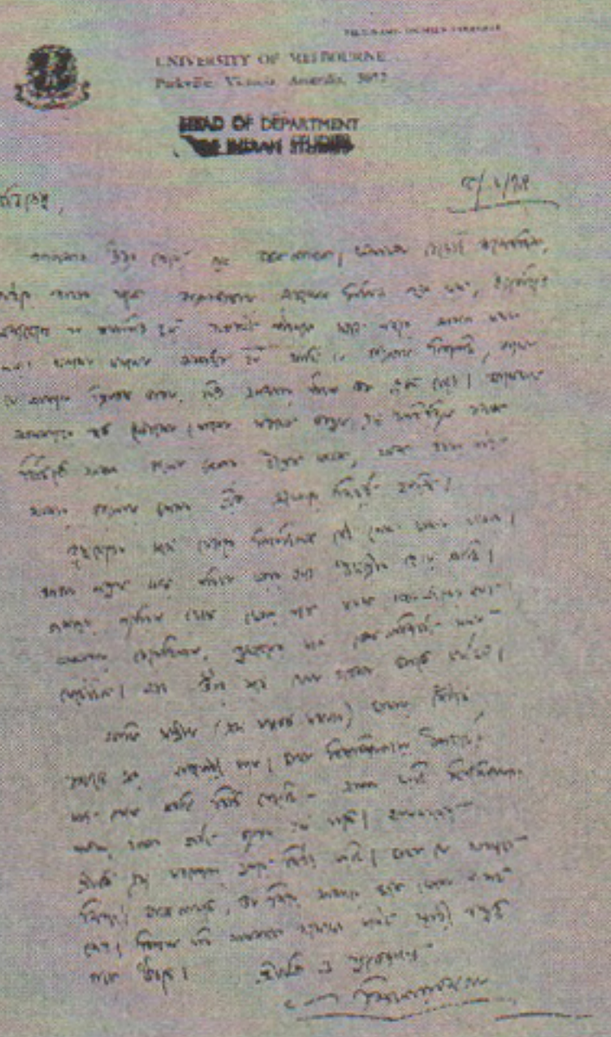
UNIVERSITY OF MELBOURNE
Parkville Victoria Australia 3052
HEAD OF DEPARTMENT
OF INDIAN STUDIES

তিনি এম. এন. রায়ের Radical Humanism দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর সহযোগী হিশেবে প্রচুর কাজ করেছেন। যার ফলে তাঁর ইংরেজী ভাষায় লেখা বইয়ের সংখ্যা কম নয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : 'সাহিত্যচিন্তা', 'কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা', 'প্রবাসের জার্নাল', 'মৌমাছিতন্ত্র', 'রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র ও নক্ষত্রসংকেত', 'খাড়াইয়ের দিকে', 'রেনেসাঁস', 'Radicalism', 'In Man's Own Image', 'Explorations', 'The Intelligentsia', 'Rabindranath Tagore'।

তাঁর 'রেনেসাঁস' গ্রন্থটি ঢাকা থেকে শিল্পতরু প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। আমরা শিল্পতরু প্রকাশনীর এ উদ্‌যোগকে প্রশংসনীয় মনে করি।

শিবনারায়ণ রায়ের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়ক এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৯১-এর শারদীয় 'প্রতিক্ষণ'-এ।

একজন বিবেকী সমালোচক একজন বিবেকী কথাসাহিত্যিকের সম্পর্কে যা বলেছেন তা বিবেচক পাঠকদের ভাবনার উদ্রেক করবে বলে আমরা মনে করি। পাঠককেও সাহিত্যসম্ভোগ শিখতে হয়। আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচকদের কাছে নিরন্তর পাঠগ্রহণের মাধ্যমেই তার এই গুণ অর্জিত হতে পারে। এইসব কথা বিবেচনায় এনেই এ প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ।

– সম্পাদক]

আজ সখেদে স্মরণ করি যে প্রথম যুগের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে যিনি বাংলা ভাষায় সম্ভবত সবচাইতে মৌলিক ও প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। পরে জানতে পেরেছি বয়সের হিসেবে তিনি আমার চাইতে মাত্র বছর দেড়েকের ছোট ছিলেন; তাঁর প্রথম বই 'নয়নচারা' এবং আমার প্রথম বই 'প্রেক্ষিত' একই বছর (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়; মুক্তবুদ্ধি সাহিত্যিক-সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' পত্রিকায় আমরা প্রায় একই সময়ে লিখেছি। দেশ বিভাগের আগে প্রথম যৌবনে কলকাতায় যাঁরা ছিলেন মানসসম্পর্কে তাঁর আত্মীয়প্রতিম তাঁদের ভিতরে কারো কারো সঙ্গে (যেমন কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) ঐ দশকেই বয়সের ব্যবধান পেরিয়ে আমারো বন্ধুতা গড়ে ওঠে। এমন কি সনতারিখের হিসেব মেলাতে গিয়ে বুঝতে পারছি পারীতে কিছুকাল আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। তবু যে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎপরিচয় ঘটেনি, তাঁর মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে ঢাকায় কয়েক মাসের জন্য আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ না পেলে তাঁর অসামান্য শৈল্পিক অর্ন্তদৃষ্টির সন্ধান পেতে আমার হয়তো আরো বিলম্ব হত, এই ত্রুটি ও দুর্ভাগ্যের জন্য একান্তভাবে আমিই দায়ী।

আসলে আমি চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি সযত্নে আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের অনুশীলন করেছি। এবং বয়ঃপ্রাপ্তি কালেই নাস্তিক্য ও বিশ্বনাগরিকতা আমার প্রতিন্যাসে অনুস্যূত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আরো অনেক শিক্ষিত সাহিত্যপ্রেমী বাঙালি হিন্দুর মত আমিও বহুদিন পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ ছিলাম। মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, কাজী আবদুল ওদুদ, গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া সেকালে কোন বাঙালি মুসলমানের রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল ? বই সংগ্রহ করে পড়ার ব্যাপারে আমি অলস দীর্ঘসূত্রী নই, কিন্তু কায়কোবাদ, রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, বেগম রোকেয়া হোসেন, ইমদাদুল হক, নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদ, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নেতা আবুল হুসেন, আবুল ফজল প্রভৃতির রচনাবলী বাংলাদেশে যাবার আগে অন্তত আমি পড়িনি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাম অবশ্য আমি শুনেছিলাম; সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উদ্যোগে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' এবং উর্দু, ফরাসী ও ইংরেজি অনুবাদে প্রকীর্তিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৯) আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল; কিন্তু ১৯৭৫ সালের দুর্যোগপিঙ্গল বাংলাদেশের বিদ্যুদ্‌গর্ভ প্রদোষে তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি না পড়া পর্যন্ত তাঁর মনশ্চক্ষুর অসামান্যতা আমাকে ব্যবর্তিত করে নি।

সব মহৎ রচনার মত 'চাঁদের অমাবস্যা'-রও একটি সার্বকালিক ও সার্বজনীন গূঢ়ার্থ আছে, কিন্তু প্রথম পাঠেই আমার মনে হয়েছিল দরিদ্র, অনভিজ্ঞ, শূন্যস্বাস্থ্য, গ্রামবাসী, 'বয়োতীত' যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর কাহিনীতে বিশেষভাবে সমকালীন বাংলাদেশের আত্যন্তিক সংকটই যেন উদ্ভাসিত হয়েছে। অথচ কৌতূহলী হয়ে যাঁকেই প্রশ্ন করি তিনি বলেন 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি দুর্বোধ্য উপন্যাস, এটির লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ প্রবাসী হওয়ার ফলে দেশের বাস্তব অবস্থা বিষয়ে অজ্ঞ এবং অনবহিত, তাঁর অনাশ্রয় কল্পনা তৎকালীন পশ্চিমী সাহিত্যের অনুচিকীর্ষু। কিন্তু এইসব অভিযোগ আমার কাছে আদৌ গ্রহণযোগ ঠেকে নি। প্রবাসী তুর্গেনিভ ও জয়েস অনুধ্যায়ী স্মৃতি ও

কল্পনার সামর্থ্যে আপন আপন স্বদেশ ও স্বকালের মর্মোদ্‌ঘাটন করেছিলেন। সকলের না হোক কোনো কোনো শিল্পী ও ভাবুকের ক্ষেত্রে দূরত্ব অনুপ্রবেশের সহায়ক। মুজিবী শাসনের সেই শেষ দিনগুলিতে বাংলাদেশের সদ্যোজাত গণতন্ত্র যখন সর্বনাশের দিকে দ্রুত ধাবমান, ব্যাপক অপচার, পৌনঃপুনিক অধ্যাদেশ এবং বেপরোয়া গুণ্ডামির চাপে নিরীহ, দুর্বল, অনুভূতিশীল অসংগঠিত সাধারণ মানুষ যখন বিক্ষুব্ধ, সন্ত্রস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বর্তমানে বীতরাগ ও ভবিষ্যতে আস্থাহীন, যন আমার চেনাজানা অধ্যাপক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিক্ষক-ব্যবহারজীবী-চিকিৎসক এবং ছোটমাঝারি আমলারাও ফৈজতের ভয়ে অস্বভাবী মৌনে আক্রান্ত, তখন সেই দমবন্ধ পরিবেশে 'চাঁদের অমাবস্যা' আমাকে সাহায্য করেছিল সমকালীন বাংলাদেশী শিক্ষিতজনের দুরপনেয় অর্ন্তদ্বন্দ্বকে বুঝতে, সঞ্চার করেছিল দ্বন্দ্ব-উত্তরণের সম্ভাবনায় বিশ্বাস।

অথচ 'চাঁদের অমাবস্যা' কেনো অর্থেই রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা থেকে জানা যায় যে এটির 'বেশির ভাগ ফ্রান্সের আলপ্‌স্‌ পর্বত অঞ্চলে পাইন-ফার-এলম গাছ পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে লেখা হয়।' এটির প্রথম প্রথম প্রকাশ ঘটে ঢাকায় ১৯৬৪ সালে, অর্থাৎ আমি যখন এটি পড়ি তার ন বছর আগে। কিন্তু বাংলাদেশের সংকট ও অর্ন্তদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই। তাছাড়া একি শুধু বাংলাদেশের মানুষদেরই সংকট ? একই ধরনের অত্যয়, অন্দর্দাহ, সন্ত্রাসজাত বিমূঢ়তা ও স্তোভের চেষ্টা, অক্ষমতার গ্লানি ও দায়িত্ববিমুখ আন্যত্রিকতার উৎকণ্ঠা কি ভারতে ইমার্‌জেন্সির সময়ে আমরা দেখি নি ? অথবা পরোক্ষ সূত্রে এরই কথা কি আমরা শুনি না হবাইমার রিপাবলিকের পতনকালে রচিত সাহিত্যে, নাটসি-বিজিত ফরসীদেশের অস্থিতপঞ্চে, রক্তপিচ্ছিল জাকার্তার মুহ্যমান মৌনে ? আরেফ আলী বিশেষ স্থানকালের বিশেষ একজন মানুষ— 'কোপন নদীর ধারে ক্ষুদ্র চাঁদপারা গ্রামে তার জন্ম', 'দরিদ্র সংসার, হাতের তালুর মত একটুকরো জমিতে জীবনধারাণ চলে না', 'কষ্টেসৃষ্টে নিকটে জেলা-শহরে গিয়ে আই-এ. পাস করেছে', 'বয়স বাইশ-তেইশ, কিন্তু তার শীর্ণ মুখে, অনুজ্জ্বল চোয়ালে বয়োতীত ভাব', গ্রাম্যস্কুলের শিক্ষক, গ্রামের বড়বাড়ির কর্তা দয়াশীল ও ধর্মপ্রাণ দাদাসাহেবের আশ্রয়ে সে-বাড়ির বাইরের ঘরে তার বসবাস, মাইনে বাবদ যে-সামান্য টাকা পায় বুড়ি মায়ের হাতে দিয়ে আসে— কিন্তু একই সঙ্গে আরেফ আলী সব দেশের ভীত, সঙ্কুচিত, দুর্বল, অসহায়, কল্পনাপ্রবণ, অনুভূতিশীল, বিবেকী কিন্তু নিরুদ্যম, সহৃদয় ও ম্রিয়মাণ সাধারণ মানুষেরই প্রতিভূ। ওয়ালীউল্লাহ্‌-র মহত্ত্ব এইখানে যে সংকটাক্রান্ত আরেফ আলীর আর্ত অপহ্নুতির প্রয়াসকে তিনি যেমন দুর্লভ নিপুণতায় অপাবৃত করেছেন তেমনি পরিশেষে তার অনভিভবনীয়, অঘোষিত, প্রত্যাশারিক্ত, শঙ্কাদীর্ণ দায়িত্ববোধের অনাদৃত প্রকাশকেও আমাদের কাছে সম্পুর্ণভাবে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌ সার্থক শিল্পী ও যথার্থ মানবতন্ত্রী।

দুই

'চাঁদের অমাবস্যা'র আখ্যানিক পরিণাহ মোটামুটি এই মতো :

শীতের এক উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাতে আরেফ আলী শারীরিক প্রয়োজনে ঘুম ভাঙলে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। শিক্ষকতা করা সত্ত্বেও তার মনে 'জ্যোৎস্নারাতের প্রতি আকর্ষণ' এখনো পর্যন্ত 'অদমনীয়'। তার মনে হয় এত সৌন্দর্য অর্থহীন নয়, তা মহারহস্যের ইঙ্গিতবাহী, এই রকম রাতে 'বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে'। কিন্তু এ সব ভাবনা সে গোপন রাখে, সে নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন। শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে ঘরে না ফিরে সে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার রূপ দেখে। সেই সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ে যে তার আশ্রয়দাতা আলফাজউদ্দিন চৌধুরী বা বড়বাড়ির দাদাসাহেবের ছোট ভাই কাদের চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছে। কাদের 'নিষ্কর্মা', দিনের বেশির ভাগ সময় বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে থাকে, কখনো বা সারাদিন পুকুর ধারে ছিপবড়শী নিয়ে কাটায়, কারো সঙ্গে মেশে না, হঠাৎ রেগে ওঠে, বিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বউ-এর প্রতি উদাসীন, রাতে বেরিয়ে যায় এবং সকালে যখন ফেরে 'তার মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন, কিন্তু চোখ অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি অলৌকিক তৃপ্তি-সন্তোষ-ভাব'। দাদাসাহেব তাঁর এই অদ্ভুত প্রকৃতির ভাইটিকে নিজের পরিবারে ও সমাজের গ্রহণীয় করবার জন্য রটিয়েছেন যে কাদের 'দরবেশ মানুষ', রাতে সে 'বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়'। কথাটা তিনি নিজে 'সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন, তা নয়', তবে বিশ্বাস করতে চান, অন্তত অন্যদের বিশ্বাস করাতে চান, যদিও ছোট ভাইকে তিনিও আদৌ বোঝেন না।

জ্যোৎস্নালোকে কাদেরকে দেখে আরেফ কৌতূহলী হয়ে তাকে অনুসরণ করে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে হারিয়ে ফেলে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে বাঁশবন থেকে সে চাপা ভারি কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ভয় পেয়ে সে 'হাততালি দিয়ে রাখালের মত গরুডাকা আওয়াজ করে ওঠে।' পরক্ষণেই বাঁশবনে একটি মেয়েমানুষের সভয় চিৎকার এবং পাথরচাপা দেওয়া স্তব্ধতা— সাপের মুখে ঢোকা ব্যাঙের ডাক হঠাৎ থেকে যাওয়ার মত। অবশদেহ আরেফ শুনতে পায় বাঁশবন থেকে কে যেন সরে যাচ্ছে। মনে জোর করে এগিয়ে যেয়ে দেখে যে বাঁশঝাড়ের 'আলো-আঁধারের মধ্যে একটি যুবতী নারীর মৃতদেহ, অর্ধ-উলঙ্গ, পায়ের কাছে এক ঝলক আলো'। বিভ্রান্ত অবস্থায় বাঁশঝোপ থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার সে হঠাৎ দেখে সামনে দাঁড়িয়ে কাদের। আরেফ 'কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই।' 'সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে শুরু করে।' সে বাড়ি ফেরার পর শেষ রাতে কাদের তার ঘরে আসে, প্রশ্ন করে, আরেফ বাঁশবনে কী করছিল, কেন সে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আরেফ উত্তর না দিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। কাদের ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যায়।

রাতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সারাদিন আরেফকে ভাবায়, অভিভূত করে রাখে। সে 'একটা গোলকধাঁধায় ঢুকেছে যার আকৃতি-পরিধি কিছুই জানে না, যার অর্থ সে বোঝে না।' নিজেক সে বোঝাতে চেষ্টা করে বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি যতই বীভৎস হোক, সে নিজে 'দর্শক মাত্র', এই দৃশ্যের 'পাপ-নৃশংসতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' কিন্তু রাতে কাদের আবার তার ঘরে আসে, 'যন্ত্রচালিতের মত' বিমূঢ় আরেফকে সঙ্গে নিয়ে যায়, বাঁশঝাড় থেকে মৃতদেহটি তুলে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবার কাজে আরেফকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করে। আরেফ কাদেরের অন্ধকার মুখে দেখতে পায় আরেফের প্রতি তার 'পরম ঘৃণার ভাব।' কাদের চলে যায়, আর তারপর থেকে শুরু হয় আরেফের নিজের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই।

আরেফ মনের অন্তঃস্থলে জানে কী ঘটেছে, কে খুনী, নিহত নারীর শব যে সে দেখেছে এবং সেই শব নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার কাজে খুনীকে সে যে যত অনিচ্ছাতেই হোক, যত বিমূঢ় দশাতেই হোক সহায়তা করেছে এ সত্য প্রকাশ্যে স্বীকার করা তার অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব, এ কথা প্রকাশ না করলে ঐ নারীর মৃত্যু অর্থহীন, এবং তার নিজের জীবনের শূন্যগর্ভতা অসহনীয়। অপর পক্ষে দাদাসাহেব এবং কর্তৃপক্ষের কাছে একথা বলবার অবশ্যম্ভাবী ফল কী তা নিয়েও তার মনে সন্দেহ নেই। দরিদ্র, নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব মানুষ সে; তার আশ্রয় ঘুচবে, চাকরিটি যাবে, দয়ালু শক্তিমান

ওয়ালীউল্লাহ্‌-র মহত্ত্ব এইখানে যে সংকটাক্রান্ত আরেফ আলীর আর্ত অপহ্নুতির প্রয়াসকে তিনি যেমন দুর্লভ নিপুণতায় অপাবৃত করেছেন তেমনি পরিশেষে তার অনভিভবনীয়, অঘোষিত, প্রত্যাশারিক্ত, শঙ্কাদীর্ণ দায়িত্ববোধের অনাদৃত প্রকাশকেও আমাদের কাছে সম্পুর্ণভাবে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌ সার্থক শিল্পী ও যথার্থ মানবতন্ত্রী।

আশ্রয়দাতা তার শত্রু হয়ে উঠবে, কর্তৃপক্ষ খুব সম্ভবত তার কথা আদৌ বিশ্বাস করবে না, তার আত্মীয়স্বজন ও সহকর্মীরা তার এই সত্যকথনের সমর্থন তো করবেই না, উলটে তার নির্বুদ্ধিতার নির্দয় সমালোচনা করবে, তার আচরণের পিছনে কোনো কুৎসিত কারণ খুঁজবে। আরেফ জানে যে সে 'ভীত, দুর্বলচিত্ত, অসহায় মানুষ'; এখানে অন্তত সে নিরাপত্তা, বাসস্থান ও যত কম মাইনের হোক একটি চাকরি পেয়েছে; দাদাসাহেবের 'স্নেহশীল ছাতার' নীচে থেকে সে তার 'জীবনে সর্বপ্রথম বেদনাদায়ক অভাব-অভিযোগটা যেন ভুলেছে', মাকে মাইনের 'টাকা দেবার সময় জীবনে এই প্রথম সে সুখবোধ করছে।' অতএব আর পাঁচজনের মত আরেফ আলীও নানা ভাবে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে যে-ভয়ানক ঘটনা সে দেখেছে ভাবছে তা হয়ত আসলে এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন মাত্র, অথবা হয়ত কাদের সত্যিই দরবেশ এবং এই খুন সে করে নি, অথবা সংসারের অন্তহীন রহস্যের মত এও এক রহস্য যার অর্থ তার অবোধ্য, অথবা হয়ত কাদেরের আচরণের পিছনে একটি 'স্বল্পভাষী, গোপনস্বভাবের প্রেমিকমানুষের' প্রচণ্ড প্যাশন এবং আত্মকর্তৃত্বহীন দিশেহারা আকস্মিক ভয় কাজ করেছিল, অথবা সত্য প্রকাশের দ্বারা কারো উপকারের সম্ভাবনা নেই, বরং আশ্রয়দাতা দাদাসাহেবকে তার দ্বারা নিষ্ঠুর আঘাত করা হবে, কাদেরের চরম শাস্তি হতে পারে, এবং তার নিজেরও সমূহ সর্বনাশ ঘটবে। কিন্তু নিজেকে বিভিন্ন 'কাল্পনিক অথবা' দিয়ে নানা ভাবে বুঝিয়েও সে না পারে সত্যকে চাপা দিতে, না পারে নিজের দায়িত্ববোধকে এড়িয়ে যেতে। শীতকালের শান্ত নিস্তেজ নদীতে স্টিমারের উজ্জ্বল সাদা সন্ধানী আলোয় মেয়েটির ফেঁপে ফুলে ওঠা বিবস্ত্র শব আবিষ্কৃত হয়; জানা যায় মেয়েটি ঐ গ্রামেরই করিম মাঝির বউ; কাদের নিজেই তার কাছে রাতের গোপনে দু'এক কথায় স্বীকার করে যে সে ভয় পেয়ে পারিবারিক সুনামের কথা ভেবে তার উপযাচিকাকে খুন করেছে এবং তার স্ফীত, রক্তবর্ণ, ঘূর্ণ্যমান চোখ দেখে আরেফের মনে কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে 'কাদেরের পক্ষে দরিদ্র মাঝির বউ-এর প্রতি কোনো ভাবাবেগ বোধ-করা সম্ভব নয়।' কাদের আবার রাতে এসে তাকে, শাস্তির ভয় দেখায়। কোনো রকমের স্তোভ থেকেই আরেফ আলী শান্তি বা স্বস্তি পায় না। তাকে নিজের কাছে শেষ পর্যন্ত স্বীকার কারতে হয় যে 'আত্মরক্ষার প্রবল বাসনা থেকেই তার এই অধ্যবসায়ী আত্মপ্রবঞ্চনার উদ্ভব; 'মানসিক দ্বন্দ্ব অসহ্য হওয়াতে সে স্বপ্নরাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, 'ভীতির নগ্ন চেহারা দেখে বিবেকের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়েছে', কিন্তু যে মানুষ জীবিত থাকবার জন্য সত্যকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত এবং নিহত নারীটির জন্য যার মনে সমবেদনা বোধ পর্যন্ত নেই সে 'নামেই শুধু জীবিত।' আসলে তেমন মানুষ মৃত, তার জীবন 'ধার করা জীবন।'

অতএব আরেফ আলী শেষ পর্যন্ত দাদা সাহেবের কাছে সত্যকথাটি নিবেদন করে, তারপর 'বিসদৃশভাবে উঠে দাঁড়িয়ে' তাঁর কাছে বিদায় নেয়। সে হাঁটতে শুরু করা মাত্র স্তম্ভিত বড়বাড়ি থেকে দাদাসাহেবের গুরুগম্ভীর ডাক আসে, ভীত আরেফ আলী ছুটতে শুরু করে। থানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনার কথা পুলিশকে জানায়। কিন্তু পুলিশ কর্মচারীটি তাকে ধমকায়, বাঘাগলায় বলে 'চালাকি করতে চেয়েছিলেন', থুথু ছিটিয়ে, আবার বলে, 'কী, অপরাধ স্বীকার করতে রাজী আছেন', তাকে ভয় দেখায়, 'আজগুবী কথা' না ছাড়লে আরেফের নিজেরই ক্ষতি হবে বলে সতর্ক করে, তাকে মনে করিয়ে দেয় তার বৃত্তান্তের পক্ষে কোনো সাক্ষী নেই, সে নিজে কাউকে খুন করতে দেখে নি, কিন্তু যুবতীর লাশের পাশে তার উপস্থিতি, কাদের স্বচক্ষে দেখেছে। পুলিশের এসব যুক্তিই আরেফ আগে থেকে জানে, তার কাজের 'কী পরিণাম হবে, কেন হবে, কী কী ভাবে হবে– সেসব কথা উপলব্ধি করে তার ভীতির শেষ থাকে নাই। ... তা এমনই একধরনের ভীতি যা শরীরে কোথাও গভীর ক্ষতের মত লেগে আছে, তা উপড়ানো যায় না, অস্বীকার করাও যায় না।' তবু সেই নারীর প্রাণহীন দেহের স্মৃতি তাকে তাড়িত করেছে, সত্যকে স্বীকার না করে, দায়িত্বপালন না করে, নিজে শাস্তি নিয়েও ঐ মৃত্যুকে নিরর্থকতা থেকে রক্ষা না করে তার পক্ষে মানুষ হিসেবে বাঁচা সম্ভব নয়। পুলিশ কর্মচারীর ব্যঙ্গ, অবিশ্বাস, ভয় দেখানো তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। তার 'গায়ের জীর্ণ আলোয়ানটি ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অতিশয় জীর্ণ মনে হয়।'

আরেফ-এর অর্ন্তদ্বন্দ্ব, নিষ্ঠুর সত্য এবং প্রতিশ্রুতিরিক্ত দায়িত্ব-চেতনাকে এড়াবার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা, সেই প্রয়াসের ব্যর্থতা, এবং ভয়ে, সংকোচে, অনিচ্ছায় তবু ভিতরকার তাগিদেই তার আশাহীন সততার প্রকাশ— অসামান্য নিপুণতায় ধাপে ধাপে আরেফের আচরণ, কল্পনা, অনুভূতি এবং আত্মবিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ এ সব ফুটিয়ে তুলেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্-র শব্দ নির্বাচনে এবং বাক্যের গঠনে কিছু কিছু ত্রুটি পীড়া দেয়; জাতশিল্পী এবং নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও হয়ত দীর্ঘদিন জন্মভূমি থেকে দূরে থাকার ফলে তাঁর বাংলা শব্দের জ্ঞান যথেষ্ট শীলিত হবার সুযোগ পায় নি। শ্রুতিসুভগ ধ্বনি-বিন্যাসের চাইতে ব্যঞ্জিত বাকপ্রতিমা উদ্‌ভাবনে তিনি বেশি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু 'চাঁদের অমাবস্যা'য় তিনি যে-মানবীয় সংকটকে তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে নির্বাচন করেছিলেন এবং সেই গভীর ও জটিল, ব্যক্তি ও সঠিক বিষয়টিকে তিনি যেভবে তীক্ষ্ণ অর্ন্তদৃষ্টি ও সুবেদী কল্পনা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নিতান্ত দুর্লভ। অন্তত বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে যাঁরা স্বীকৃতভাবে প্রধান পূর্বসূরী— বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক— তাঁদের উপন্যাসরাজিতে এই বিষয়টি এভাবে এত সার্থকতার সঙ্গে কোথাও পরিচিন্তিত ও পরিদৃশ্যমান হয় নি। ওয়ালীউল্লাহ্-র চেতনায় ডস্টয়েভস্কি, কাফ্‌কা, ফক্‌নার ও কাম্যুর প্রভাব পড়ে থাকাই সম্ভব, যদি পড়ে থাকে, সে প্রভাব তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছিলেন; ফলে যে দর্পণটিতে আমরা আমাদের বিপন্ন, বিমূঢ়, সংকটাক্রান্ত, দ্বিধাদীর্ণ মুখ দেখে চমকে উঠি সে দর্পণ নৈর্ব্যক্তিক থাকে না, সেটি হয়ে ওঠে একজন বিশেষ ব্যক্তি, বাইশ-তেইশ যার বয়স, যে ভিতরে অশান্তির জ্বালা নিয়ে 'ভক্তিমান শান্তচিত্ত ব্যক্তির মত নামাজ পড়ে', যে দরিদ্র, সন্ত্রস্ত, কিন্তু জ্যোৎস্নারাতে ব্যঞ্জিত বিশ্বের নিভৃত আলাপ যার অশ্রুত নয়, যে নিঃসঙ্গ কিন্তু হৃদয়বান, নিজেকে নানাভাবে প্রতারণা করবার মত কল্পনাশক্তির যে অধিকারী, কিন্তু দায়িত্ববোধও যার প্রবল এবং অনতিক্রম্য ভয় ও নৈরাশ্য নিয়েই যে সত্যের মুখোমুখি হতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম। আরেফের সংকটাক্রান্ত অস্তিত্বের যেটুকু তার চেতানায় এবং আমাদের নজরে প্রত্যক্ষভাবে আড়ালে আরো অনেক দিকের ইঙ্গিত এই উপন্যাসে ছড়ানো আছে। আর আছে কিছু ছোট বড় চরিত্র, কেউবা দাদাসাহেব আর তার ভাই কাদেরের মত জটিল এবং মোটা সরু দুরকম তুলির টানে আঁকা কেউবা আরবীর মৌলবী অথবা দাদাসাহেবের মেয়েপক্ষের নাতি আমজাদ বা একচোখকানা কর্কশকণ্ঠ মুয়াজ্জিনের মত স্কেচ্ মাত্র। ক্যানভাস বড় নয়, বিষয়টি বড়, এবং এই বড় বিষয়কে পরিদৃষ্ট করা হয়েছে অকম্প্য নিপুণতায়, গভীর অর্ন্তদৃষ্টির সামর্থ্যে, উদাত্ত কল্পনার স্বয়ম্ভরতায়। হয়ত ওয়ালীউল্লাহ্-র জীবনদর্শন সমকালীন ফরাসী অস্তিত্ববাদীদের ভাবনাচিন্তা থেকে কিছু গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাঁর নিজস্বতা প্রশ্নাতীত। 'চাঁদের

আরেফ-এর অর্ন্তদ্বন্দ্ব, নিষ্ঠুর সত্য এবং প্রতিশ্রুতিরিক্ত দায়িত্ব-চেতনাকে এড়াবার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা, সেই প্রয়াসের ব্যর্থতা, এবং ভয়ে, সংকোচে, অনিচ্ছায় তবু ভিতরকার তাগিদেই তার আশাহীন সততার প্রকাশ— অসামান্য নিপুণতায় ধাপে ধাপে আরেফের আচরণ, কল্পনা, অনুভূতি এবং আত্মবিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ এ সব ফুটিয়ে তুলেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্-র শব্দ নির্বাচনে এবং বাক্যের গঠনে কিছু কিছু ত্রুটি পীড়া দেয়;